KALIDASA O RABINDRANATH

by Bishnupada Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ

চৈত্র ১৩৬৭/মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জি

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

নিবেদন

এই সংকলনের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে'—এই নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। 'রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-র 'রবীন্দ্র শতবর্ষ-পূর্তি' সংখ্যায় সংকলিত হয়। রচনাগুলি মোটের উপর অপরিবর্তিত ভাবেই সংগৃহীত হইল।

সংকলনটির প্রকাশ বিষয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সুহৃদ্বর ডঃ সুশীল রায় এবং 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনা সংস্থার শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের ঐকান্তিক সহযোগিতা স্মরণীয়। তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

২৫ গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা
ফাল্গুনী পূর্ণিমা। ৩রা চৈত্র ১৩৬৭

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সূচী

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী যাঁহারা নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষত সেই সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ও যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ, তাঁহারা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সহিত কালিদাসের কবিপ্রতিভার অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সংস্কৃতসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ আশৈশব অনুশীলন করিয়াছিলেন; উপনিষদের অধ্যাত্মসম্পদ্ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন; রামায়ণ ও মহাভারত তাঁহার কবিমানসকে চিরদিন প্রভাবিত করিয়াছে; অমরু-কবির শৃঙ্গার-নিঃষ্যন্দী শ্লোকরাজি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে; বাণভট্টের কাদম্বরীকথার রচনাশৈলী ও চরিত্র-চিত্রণের উদাত্ত মহিমা ও সৌকুমার্য তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছে। এ সকলেরই সাক্ষ্য 'প্রাচীন সাহিত্য' ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর নানাস্থলে অবিস্মরণীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের একক কোন্ কবি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে, কোন্ কবির কাব্য তাঁহার কবিমানসকে প্রভাবিত করিয়াছে সর্বাধিক পরিমাণে—এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর 'কালিদাস'; এবং ভারতেতিহাসের কোন্ যুগের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক আগ্রহ সহকারে উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, এই প্রশ্নেরও একমাত্র উত্তর 'কালিদাসের যুগ'। ভারতের এই দুই মহনীয় কবির প্রতিভার মধ্যে পরস্পর সাজাত্য এ পর্যন্ত বহু সমালোচকের দৃষ্টিতেই ধরা দিয়াছে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের ও কালিদাসের কাব্যসম্ভারের তুলনামূলক আলোচনার অবসরে যে কয়টি কথা প্রধানভাবে আমার মনে উদিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলির প্রতি ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই আমার বক্তব্য সমাপন করিব।

২

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে অভিনন্দন গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করা হয়, তাহাতে বিশ্ববিশ্রুত ভারততত্ত্ববিদ্ মনীষী শ্রীশৈল কণ্ব (Sten Konow) কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"It was an Indian poet who at last opened the eyes of the West. Through William Jones' translation of Kalidasa's Sukuntala Europe came to know something about India's soul,

about the ideals, the aims, and the aspirations of the people of India. And this led to a keen interest in India, her history and civilization.

"It was, however, chiefly ancient India which attracted the interest of the West. Kalidasa was the poet, and the ancient seers and thinkers were the last and noblest product of India's genius.

"Even when modern Indians came to play a role in the spiritual development of the West, it was chiefly as interpreters of the wisdom of the past that they were greeted and admired.

"Then came the day when another Indian poet conquered the West. This time it was not one of bygone times, but one who lived and sang in modern India, whose tune was that of the Indian landscape, the Indian river, the Indian forest and the Indian village of today.

"Again the West listened, and marvelled. It found the same authentic beauty, the same sublime flight of thought as in Kalidasa's immortal works : the old spirit was still alive."[১]

বৈদেশিক মনীষী যথার্থই বলিয়াছেন। বৈদিক ঋষি-কবিগণকে বাদ দিলে, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষিদ্বয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে, কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যই কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি-স্থানীয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি"।

৩

১২৯৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ২৯ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তাঁহার বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতা রচনা করেন। ইহাই বোধ হয় মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার উদ্দেশে উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ইংরেজ সমালোচক অধ্যাপক টমসন এই কবিতাটি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"More significant still, the poem is his first tribute to Kalidasa. As Dante looked across the centuries and hailed Virgil as master, as Spenser overlooked two hundred years of poetical fumbling and claimed the succession to Chaucer, as Milton in his turn saluted his "dear master Spenser," so Rabindranath turned back to Kalidasa. After this, he is to pay such homage often, glad of every chance to acknowledge so dear an allegiance. This first tribute has the impressive charm of confidence. The poet, aged twenty-nine, knows that he is India's greatest poet since Kalidasa. If the dead know of such things, the great spirit honoured by this splendid tribute must have been gladdened."[২]

সত্যই। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অনেক কবিই কালিদাসের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অন্য একাধিক কবির বন্দনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকলের মধ্যে কেমন যেন একটা 'তটস্থতা' রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের যে স্তুতি, ইহার মূলে আছে 'অন্বয়ীভাব' বা complete identification। স্তবনীয় ও স্তুতিকার এখানে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই ইহার মধ্যে এমন একটি অপূর্ব মহিমা ও গাম্ভীর্য আছে, যাহা শুধু বেদের আধ্যাত্মিক আত্মস্তুতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে।[৩]

৪

শেলি কবি কীটস্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন: "Keats was a Greek". রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও আমরা বলিতে পারি, তিনি ছিলেন কালিদাসের যুগেরই অধিবাসী। কুবেরপুরবাসী যক্ষের মতো তিনি তাঁহার কামনার মোক্ষধাম প্রাচীন উজ্জয়িনী হইতে যেন উনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল আগ্রহে বারংবার কালিদাস-বর্ণিত প্রাচীন ভারতের নদী-গিরি-জনপদ, সামাজিক পরিবেশ, সভ্যতার দিকে গিয়াছে—

এই মতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে

হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি।

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতায় কবির নির্বাসিত আত্মার করুণ বিচ্ছেদ-বেদনা অপূর্ব ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।[৪]

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের গম্ভীরমন্দ্রে 'সন্ধ্যারতি ধ্বনি', প্রিয়ার ভবন—

দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।

উজ্জয়িনীর 'জনশূন্য পণ্যবীথি', 'নগর-গুঞ্জন-ক্ষান্ত নিস্তব্ধ' বসন্তসন্ধ্যা, প্রিয়া মালবিকার 'অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস'—এ সবই কবির পূর্ব পরিচিত। এ শুধু কালিদাসের মেঘদূতের বর্ণনার অনবদ্য ভাষান্তর নয়, এ যেন জাতিস্মর মহাকবির প্রত্যক্ষকল্প পূর্বস্মৃতি—

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।

৫

এই 'জননান্তর-সৌহৃদ' রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে ফল্গুধারার ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত ছিল বলিয়াই, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যসৃষ্টির মর্মমূলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক টীকাকার, অনেক সহৃদয় সমালোচকই কালিদাসের কাব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তুলনায় সে সকল কতই না অগভীর। আর সকল ব্যাখ্যা তাই যেখানে কালিদাস-কাব্যের বহিরঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথই শুধু সেখানে কালিদাসের কাব্য-লোকের অন্তঃপুরের মধ্যে অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করিতে সাহসী হইয়াছেন।

সেই রহস্যময় অন্তঃপুরে 'দুর্বাখ্যা-বিষমূর্চ্ছিতা' কালিদাসভারতী রবীন্দ্রনাথের স্থির, সংযত প্রাতিভদৃষ্টির স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, আপনাকে নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—'জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।' রবীন্দ্রনাথ যেন কালিদাস-ভারতীকে সম্বোধন করিয়া বীণাবিনিন্দী কণ্ঠে বলিয়াছেন—

এনেছি শুধু বীণা—

দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

কালিদাস-ভারতী তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চিনিতে পারিয়া জন্মান্তরলব্ধ প্রিয়-জনকে স্মিতহাস্যে বরণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ঋতুসংহারের মূল সুরটি আর কেহ কি অনুরূপভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন? অসমাপ্ত 'কুমারসম্ভবে'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি 'যখন শুনালে কবি দেবদম্পতিরে কুমারসম্ভব গান'—এই চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। 'মেঘদূতে'র বাণী কত বিচিত্রভাবেই না রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন! নববর্ষার বিচিত্র সমারোহ ও অভিনব বাণী যাহা 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দে ঘনীভূত রহিয়াছে, তাহাকে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য কবিচিত্তের কি ব্যাকুল আগ্রহ! 'নববর্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আট্‌কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

"সকল কবির কাব্যেই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।…

"…এই জন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।"[৫]

অনেকেই তো অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মর্মকথা, মহাকবি

গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এমন অন্তর দিয়া আর কেহ কি উপলব্ধি করিয়াছেন ?

"য়ুরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে একটি মাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই।···তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

"···গ্যেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিযাছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গম্ভীর পরিণতির ভাব আছে ; সে পরিণতি, ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘের অলকাপুরীর নিত্য-সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্ব-মিলন ও একটি উত্তর-মিলন আছে। প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গ তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তর-মিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক।"

কালিদাসের সৃষ্ট চরিত্রের সহিত পরিপূর্ণ তন্ময়ীভাব না ঘটিলে কি রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিতা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করিতে পারিতেন ?

কাব্যের উপাদান তো বিশ্বের চারিদিকে চিরকালই বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় লোকোত্তর প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাবের—যিনিই শুধু সেই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে সংহতির সূত্র আবিষ্কার করিয়া উহাদিগকে একটি অখণ্ড শিল্পাকারে গ্রথিত করিতে পারিবেন ; সেইরূপ কাব্যের নিগূঢ় মর্ম আবিষ্কারের জন্যও প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় প্রতিভাবান্ সমালোচকের, যাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টির ঘনীভূত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"যুগের পর যুগ ধরে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন করেই চলল—কবে মেঘের কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন শহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে হুইস্‌লার এসে তার মধ্যে থেকে আনন্দ পাবেন বলে।' পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস্, এক মাইলোস, এক রোঁদাঁ, এক মেলট্রোডিফ ব্রেজেস্কা এমনি জানা এবং দেশের বিদেশের অজানা artistদের জন্য। মোগলবাদশার

রত্নভাণ্ডারে তিনপুরুষ ধরে জমা হতে লাগল মণিমাণিক্য সোনারূপা—এক রাজ-শিল্পীর ময়ূরসিংহাসন আর তাদের স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা, শিল্পের হাট, কারুছত্র, কলা-ভবন—এটা ওটা বসাচ্ছি সব সেই একটি আর্টিস্টের একটি রসিকের জন্য—সে হয়তো এসেছে কিম্বা আসবে।"[৬]

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তু তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

এ শুধুই কবি ভবভূতির অভিমানোক্তি নহে, শিল্পসমালোচনার একটি পরম রহস্য ইহার মধ্যে প্রকাশমান।

মহাকবি কালিদাসের দূরাগত বাণীমূর্চ্ছনা সমানধর্মা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রীতেই অপূর্ব অনুরণন জাগাইয়াছিল।

৬

বস্তুত, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের এই পরস্পর সমধর্মিত্ব শুধু উভয়ের প্রতিভা ও অন্তর্জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। আমার দৃষ্টিতে উভয়ের বহির্জীবনেও এই সমধর্মিত্ব যেন সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান। দুইজনেই শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্ধাভিষিক্ত—সেইজন্য দুইজনেরই কাব্যজগৎ রসময়।[৭]

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

অথবা বসুন্ধরাকে উদ্দেশ করিয়া যেমন তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে,
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা-পরা তব কটিদেশ'...

কালিদাসও সেইরূপ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের সপ্তম অঙ্কে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে অবতরণকালে মহারাজ দুষ্যন্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন— "অহো উদার-রমণীয়েয়ং

পৃথিবী।"

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের ন্যায় প্রকৃতিপ্রেমিক কবি যেমন দুর্লভ, আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে একক। বৎসরের আবর্তনশীল ঋতুচক্রের প্রতিটি ঋতু যেমন কালিদাসের লেখনীস্পর্শে অমরতা লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথও এই ঋতুচক্রের সৌন্দর্য ও মহিমা তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় ও বিশেষ করিয়া, ঋতুনাট্যগুলিতে অপূর্ব ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রকারে আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই উভয়ের অন্তর্লোকের ঘনিষ্ঠ গঠনসাম্য ও দৃগ্-ভঙ্গীর বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। কিন্তু বহির্জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সেখানেও আমরা দেখিব উভয়ের কবিজীবনের উপক্রম ও উপ-সংহারের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে!

মহাকবি কালিদাসের কবিজীবনের সূত্রপাত যে সুখপ্রদ হয় নাই তাহা 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনাতেই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। ক্রমশ তিনি সহৃদয় পাঠকহৃদয়ে আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু 'দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপে'র বেদনাকর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই বিরোধিতার সাক্ষ্য সমসাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্য' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতাটি শুধু যে মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়াই রচিত তাহা নহে, ইহা তাঁহার স্বকীয় জীবন সম্পর্কেও সমানভাবে সত্য—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ, যত,
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা-ষড়্‌চক্র, আঘাত গোপন!
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি!
তবু সে-সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

জীবদ্দশায় কবিদ্বয় দেশবাসীর পূজা ও রাজ-সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে তাঁহারা উভয়েই এমন এক উন্নতস্তরে উঠিয়াছিলেন, যেখান হইতে এই উদার-রমণীয় পৃথিবীর সর্ববিধ আকর্ষণ, জনসাধারণের সর্বপ্রকার স্তুতিগান তাঁহাদের নিকট অর্থহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তাই কালিদাসের পরিণত সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র ভরতবাক্যে যেমন গভীর নির্বেদ ও অনাসক্তির সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয্যতাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

সেইরূপ রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-জীবনের প্রান্তে উপনীত হইয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে, শুনি, ঘণ্টা বাজে,
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা; সেইসঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি, বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।
—'জন্মদিন' : সেঁজুতি

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের দুইজন শ্রেষ্ঠ মহাকবির বিদায়-বাণীও যেন একই সুরে গ্রথিত!

পরিশেষে, মনস্বী সমালোচক শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপন করিতে চাই—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মেলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজ-কবি

ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর কাব্য-পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বর্হ খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।" ৮

১ Sten Konow : *Rabindranath Tagore* (The Golden Book of Tagore, Calcutta 1931, p. 130).

২ Edward Thompson : *Rabindranath Tagore—Poet & Dramatist* (Oxford University Press, 1926), p. 74.

৩ এই প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলীর অন্তর্গত 'মেঘদূত' ও 'কালিদাস' কবিতাদ্বয় তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ও কালিদাসের উদ্দেশে অন্যান্য কবিতার সহিত এই দুইটি কবিতা মিলাইয়া পড়িলে আমাদের উপরিউক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

৪ 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতাটির সহিত 'কল্পনা'র অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য আছে বটে। এক বর্ষণমুখরিত শ্রাবণ-নিশীথে বাংলার বৈষ্ণব কবিদের বিস্মৃতপ্রায় কল্পলোকে কবি মানসযাত্রা করিয়াছেন—

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

কিন্তু নামগত সাদৃশ্য ও ভাবগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও সহৃদয় পাঠকের কাছে দুইটি কবিতার স্বাদ কতই না ভিন্ন! উজ্জয়িনীর প্রতি কবির যেন হৃদয়ের টান,—'হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্'—বৈষ্ণব কবির জগৎ যেন শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য! এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

It is the custom in Bengal to call him a disciple of the Vaishnava poets which is as if we called Milton a disciple of Sylvester or Du Bartas. "The influence of the Vaishnava is more apparent," says Mr. Mahalanabis, "since it is an influence on the form, while Kalidasa's is one on the spirit of his poetry; but the influence of the latter is far deeper."—Edward Thompson : *Rabindranath Tagore*, p. 306.

৫ 'মেঘদূতের' উক্ত ব্যাখ্যায় হয়তো আমাদের সকলের সম্মতি না থাকিতে পারে, অনেকের কাছে উহা mystic বলিয়া মনে হইতেও পারে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও ঐ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়—কেননা 'চিত্রা'র 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় তিনি পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন—

মেঘদূত, লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে 'আহা' !
আমি দেখায়েছি তাহা
দর্শনের নব সূত্র !

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আর সকল সমালোচনা হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য সকল সহৃদয়েরই অনুভববেদ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজের একাধিক কবিতার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে যেমন প্রয়াসী হইয়াছেন, কালিদাসের কাব্য-সমালোচনাও অনেকটা সেই ধরণের। ইহা গতানুগতিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল। রবীন্দ্রনাথের কালিদাসব্যাখ্যার মধ্যে সেইজন্য অনেকাংশে আত্মসমালোচনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

৬ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, পৃ. ১৪ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১)।

৭ শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেৎ নীরসং সর্বমেব তৎ ॥—ধ্বন্যালোক।

৮ 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' : জয়ন্তী উৎসর্গ, পৃ. ২৫ (বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৩৮)।

দেশ সাহিত্যসংখ্যা ॥ ১৩৬৫ ॥

ঋতুসংহার কি কালিদাসের রচনা ?

ঋতুসংহার কাব্যটি সত্যই কালিদাসের রচনা কি না, এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে আজও পর্যন্ত বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। তবে, মোটামুটিভাবে, ইহা কালিদাসেরই নবীন বয়সের রচনা, ইহাই প্রচলিত সিদ্ধান্ত। যাঁহারা ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদের কয়েকটি যুক্তি উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমতঃ মল্লিনাথ তাঁহার রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এই দুইটি মহাকাব্যের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে অবতরণিকা শ্লোকে বলিয়াছেন—

ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥

কালিদাসের বাণী আজ দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষক্রিয়ায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত; আমার এই 'সঞ্জীবনী' ব্যাখ্যাই তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়ং মন্দাত্মানুজিঘৃক্ষয়া।
ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্॥

মল্লিনাথকবি জড়বুদ্ধি পাঠকগণের অনুগ্রহের জন্য কালিদাসের 'কাব্যত্রয়' নির্মল-ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সুতরাং মল্লিনাথ নিজেই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তিনি কালিদাসের 'কাব্যত্রয়ে'র উপরই সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত—এই তিনখানি কাব্যই মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ঐগুলি যে কালিদাসের রচনা সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। ঋতুসংহারের উপর মল্লিনাথের কোনও টীকা নাই— সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এই অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয় যে, মল্লিনাথের মতে ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা নহে।[১] কিন্তু এই যুক্তির ভিত্তি খুব দৃঢ় নহে। মল্লিনাথ কালিদাসের সেই তিনখানি কাব্যেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলি 'দুর্ব্যাখ্যা-বিষের দ্বারা মূর্ছিত' হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঋতুসংহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন ছিল না, তাই মল্লিনাথের টীকা রচনারও কোনও আবশ্যকতা ছিল না— এইরূপ অনুমানই অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

বিরোধী পক্ষের দ্বিতীয় যুক্তিটিও সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ঋতুসংহারের রচনাশৈলী দুর্বল, কবিত্বশক্তির ন্যূনতা ও অপরিপক্ক

অবস্থাও বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া ঋতুসংহারকে কালিদাসের কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইবে না কেন? ঋতুসংহার কবির নবীন বয়সের রচনা, দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে যেমন মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক। অতএব বয়সের নবীনতাই ভাষা ও ভাবের অপরিণত অবস্থার একমাত্র সংগত কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ইহা ছাড়া, কালিদাসের অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ঋতুসংহার কাব্যখানির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। প্রকৃতিপ্রীতি কালিদাসের প্রতিভার একটি বিশেষ ধর্ম— ঋতুসংহারের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত তাহাই মূল সুর। কালিদাস তাঁহার পরিণত রচনাবলীর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন— কালিদাসের দৃষ্টিতে এই মর্ত ভুবন যেন একটি সুবিস্তীর্ণ 'ঋতুরঙ্গশালা'। ঋতুসংহারে তাঁহার পরিণত কবিমানসের সেই বিশিষ্ট দৃগ্‌ভঙ্গীরই যেন পূর্বাভাষ আমরা পাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—

"In *Meghaduta* he describes the rainy season, in *Sakuntala* the summer, in *Vikramorvasi* the winter, again, in *Kumarasambhava* the untimely spring, in *Malavikagnimitra* the spring in a royal garden and in *Raghuvamsa* almost all the seasons. He describes the summer in the 16th, the rains in the 12th, the autumn in the 4th, and the spring in the 9th Canto. But the germs of all these magnificient descriptions are to be found in the *Ritusamhara*. There cannot be the least shadow of a doubt that all the seven poems are by the same great poet and it is a matter of congratulation that with a careful and deep study of his works the number of those who held that all the books were not by one man is diminishing rapidly." [২]

এমন কি, ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব তাঁহার 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নিবন্ধে ঋতুসংহার সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে—

"Perhaps no other work of *Kalidasa's* manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of observation, and his skill in depicting an Indian landscape in vivid colours." [৩]

ঋতুসংহার কাব্যখানি এতদূর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত না হইলেও কালিদাসের রচনার মূল লক্ষণগুলি যে ইহাতে অপরিণত অবস্থায় বিরাজমান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই সারবান্ তেমনই সার্থক—

"In the absence of external evidence, which is in itself of little value unless received from definite and contemporary or almost contemporary sources. the test of personality is all important... In the *Seasons*, Kalidasa's personality is distinctly perceived as well as his main characteristics, his force of vision, his architecture of style, his pervading sensuousness, the peculiar temperament of his similes, his characteristic strokes of thought and imagination, his individual and inimitable cast of description. Much of it is as yet in a half-developed state, crude consistence, not yet fashioned with the masterly touch he soon manifested, but Kalidasa is there quite as evidently as Shakespeare in his earlier works, the *Venus and Adonis* or *Lucrece*." [8]

অন্যান্য যুক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অলংকার নিবন্ধসমূহে ঋতুবর্ণনের উদাহরণ প্রসঙ্গে ঋতুসংহার হইতে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই, ইহা সত্য বটে: কিন্তু একই কবির পরিণত রচনা হইতে উদাহরণ উদ্ধার করিয়া দেখানো যেখানে সম্ভব, সেখানে তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনার অনুল্লেখ কি অযৌক্তিক?[৫] তাহার দ্বারা ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা নয়— ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করা যায় না।

ঋতুসংহারের কাব্য বস্তু

'ঋতুসংহার' নামটিই বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। কবি এই স্বল্পপরিসর খণ্ডকাব্যে ছয়টি প্রধান ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন— গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত। কবি নিদাঘতপ্তা বিশুষ্কশোভা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়া তাঁহার কাব্য শুরু করিয়াছেন, যেন বসন্তপুষ্পাভরণা প্রকৃতিরানীকে কাব্যের অবসানে পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্যই।[৬] প্রচণ্ডসূর্য, স্পৃহণীয়চন্দ্রমা নিদাঘকাল উপস্থিত হইয়াছে; বারি-

বিহারনিরত তরুণ-তরুণীগণের বাহুসঞ্চালনে সরোবরের বিশুষ্কপ্রায় জলরাশি সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে।

এই নিদাঘের দিবাবসান কিন্তু বড়ই রমণীয়। বসন্তের কামোন্মত্ততা প্রশান্তপ্রায়। এইভাবে কবি নিদাঘের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন—

প্রচণ্ডসূর্য স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে॥

কামিগণ নিদাঘের সুখোপসেব্য নিশীথকালে সুবাসিত প্রাসাদপৃষ্ঠে গীতোৎসবে মগ্ন; প্রিয়ার সুগন্ধবাসিত মধুপানে তাহারা মত্ত হইয়াছে। কামিনীগণের দেহ-যষ্টিও আজ স্বল্প আভরণে ভূষিত। স্তনদ্বয় চন্দনপঙ্কচর্চিত, নিতম্বদেশে হেমমেখলা ও উন্নতবক্ষোদেশে চীনাংশুকের তনু আবরণ—

সমুদ্গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো
বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্।
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা
নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ॥

কবি এইভাবে যেমন একদিকে অন্তঃপুরে প্রমোদোৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন, অপরদিকে নিদাঘতপ্ত ধূসর দিবাভাগের রুক্ষ মূর্তির চিত্রও আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রবিকরতপ্ত ফণী আজ শত্রুতা ভুলিয়া ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; মৃগপতিও আজ হতোদ্যম, অদূরস্থিত গজযূথকে উপেক্ষা করিয়া সে অলস মধ্যাহ্নে বিলোলজিহ্ব হইয়া অবস্থান করিতেছে; বরাহযূথ উত্তাপ-প্রশমনের উদ্দেশ্যে মুখাগ্রভাগ দ্বারা প্রোথিত কর্দমশয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছে; মহিষকুলও তৃষার্ত হইয়া অদ্রিকন্দরনিঃসৃত জলধারার দিকে ধাবিত হইতেছে। দাবাগ্নিদগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা শুষ্কপ্রায়; দাবদাহভীত বিহগকুল পর্ণশূন্য বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে; কপিকুল অদ্রিনিকুঞ্জে আশ্রয়-গ্রহণে উদ্যত; গবয়যূথ জলান্বেষণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে দাবাগ্নির বর্ণনা যারপর নাই বাস্তব—

জলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্বতানাং দরীষু
স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যং লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন

গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ ॥
বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু
স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখানুৎপতৎপ্রাংশুবৃক্ষান্
ভ্রমতি পবনধূতঃ সর্বতোঽগ্নির্বনান্তে ॥

শ্রীঅরবিন্দের মতে ঋতুসংহারের ছয়টি সর্গে কবি যে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম সর্গে বর্ণিত নিদাঘবর্ণনাই শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের উদ্ভিদ্যমান কবিপ্রতিভার পূর্ণ সৌরভ যেন এই সর্গেই আমরা পাই—

"In the poem on Summer we are at once seized by the marvellous force of imagination, by the unsurpassed closeness and clear strenuousness of his gaze on the object; in the expression there is a grand and concentrated precision which is our first example of the great Kalidasian manner, and an imperial power, stateliness and brevity of speech which is our first instance of the high classical diction. But this Canto stands on a higher level than the rest of the poem." [৭]

দ্বিতীয় সর্গের বর্ষাবর্ণনের প্রারম্ভিক শ্লোকটিও বড় মধুর—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরঃ
তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতধ্বনি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥

বর্ষাঋতু যেন রাজসমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে— ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজি যেন গজসৈন্য, ইতস্ততঃ স্ফুরিত তড়িল্লেখাসমূহ যেন পতাকার মতো শোভা পাইতেছে, বজ্রঘোষ যেন মৃদঙ্গধ্বনি। বর্ষার আড়ম্বর বর্ণনার মধ্য দিয়াই বেশ সূচিত হইয়াছে।[৮] আজ তৃষ্ণার্ত চাতককুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী আজ বররত্নভূষিতা বরাঙ্গনার মতো শোভা পাইতেছে— চতুর্দিকে নবোদ্গত তৃণাঙ্কুরের শ্যামল সমারোহ পৃথিবীতলকে যেন বৈদূর্যমণিভূষিত করিয়াছে; ইন্দ্রগোপকীটসমূহ রক্তবর্ণ প্রবালখণ্ডের মতো সেই শ্যামশোভাকে আরও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিদাঘের খরতাপে শীর্ণ তটিনীসমূহও আজ স্ফীতকায়া, বিভ্রমবিলাসিনী রমণীগণের

মতো যেন তাহারা মত্তবেগে সমুদ্র-নায়কের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে—

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
প্রবৃদ্ধবেগাঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥

ঘনান্ধকারাবৃত বর্ষারজনীতে মেঘের গর্জন উপেক্ষা করিয়া অভিসারিকাগণ কিন্তু প্রিয়গৃহ অভিমুখে অভিসারে চলিয়াছে—

সুতীক্ষ্ণমুচ্চৈ রসতাং পয়োমুচাং
ঘনান্ধকারাবৃতশর্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ
প্রযান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

বর্ষার নববারি গিরিগাত্র বিধৌত করিয়া সর্পিলগতিতে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে—নানাবিধ বন্যকীট, ধূলিকণা ও তৃণখণ্ডে সেই জলধারা আবিল, এবং ভেককুল ত্রস্তভাবে সেই খরস্রোতা নির্ঝরিণীর দিকে চাহিয়া আছে। কামিনীগণও আজ বর্ষার অনুরূপ বেশভূষায় তাহাদের দেহ সুসজ্জিত করিয়াছে— তাহাদের কেশদামে কদম্ব, নবকেশর ও কেতকীর মাল্য, কর্ণান্তরে কুটজকুসুমের মঞ্জরী। কালাগুরু ও চন্দনের অনুলেপনে তাহাদের অঙ্গ চর্চিত— এইরূপ দৃষ্টিবিমোহন ভূষায় প্রসাধিত হইয়া তাহারা বর্ষাপ্রদোষ অতীত হইতে না হইতেই গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়সংগমকাতর হইয়া শয্যাগৃহে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকটিতেও তরুণ কবির নারীর দেহশোভাবর্ণনার অভিনবভঙ্গিটি বেশ লক্ষণীয়—

দধতি কুচযুগাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং
প্রতনু-সিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ।
নবজলকণসেকাদুদ্গতাং রোমরাজীং
ত্রিবলিবলিতশোভাং মধ্যদেশৈশ্চ নার্যঃ ॥

এতদিন পরে দাবদগ্ধ বিন্ধ্যপর্বতের শৃঙ্গরাজি বর্ষার ধারাসারের স্নিগ্ধ সম্পর্ক লাভ করিয়া যেন শান্তিলাভ করিল—

জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈ-
রয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ
সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্ ॥

বর্ষাপগমে শরদ্‌বর্ণনাও মনোজ্ঞ। শরৎপ্রকৃতি আজ নববধূর ন্যায় অভিনব সজ্জায় সজ্জিত—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদ-হংসরুত-নূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিললিতানতগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রম্যরূপা॥

আকাশ আজ শ্রান্তবর্ষণ লঘু শুভ্র মেঘপংক্তির দ্বারা সমাচ্ছন্ন— শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি যেন ঋতুরাজ শরতের রাজচিহ্ন চামরশতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নদীবক্ষে কারণ্ডবকুল সানন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তীরভাগ কাদম্ব ও সারসপংক্তির দ্বারা সমাকুল, এবং চতুর্দিক হইতেই হংসের সুমধুর নিনাদ দর্শকের শ্রোত্রসুখ বিধান করিতেছে। কুসুমশোভা কদম্ব-কুটজ-অর্জুন-সর্জ-নীপতরুরাজিকে পরিত্যাগ করতঃ স্নিগ্ধচ্ছায় সপ্তচ্ছদবৃক্ষকে আশ্রয় করিযাছে। উপবনপ্রদেশ শেফালিকা কুসুমের গন্ধে সুরভিত, তরুশাখানিষণ্ণ পক্ষিসঙ্ঘের সুমধুর কাকলীগানে মুখরিত। কুসুম-ভারাবনতা শ্যামালতা সুন্দরী রমণীর বিভূষণভূষিত পেলব বাহুর শোভা ধারণ করিয়াছে। কামিনীগণের শারদ প্রসাধনও লক্ষণীয়—

কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রান্
আপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রচলকাঞ্চনকুণ্ডলেষু
নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তে॥
হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি
শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজং কনকনূপুরশেখরৈশ্চ
নার্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি॥

ঋতুসংহারে প্রত্যেক সর্গে কবির দৃষ্টি মুখ্যতঃ দুই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সেই ঋতুর উপযোগী প্রকৃতির বর্ণনা ও কামিনীগণের শরীরশোভা ও প্রসাধন বর্ণনা। প্রকৃতি ও নারী—কবির দৃষ্টিতে যেন এ দুইটি অবিচ্ছেদ্য।[১] তরুণ কবি নারীদেহ ও নারীর কামবিলাস—কোনটির বর্ণনাতেই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত রণজিৎ পণ্ডিতের 'ঋতুসংহারে'র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিতেছি—

The poet depicts the woman's world, her love-life and the

sphere of the eternal feminine. The detailed description of her dress and decoration, jewellery and flowers, beauty aids and toilet accessories, the make up of eyes, face and lips, the use of subtle perfumes and cosmetics sound familiar and modern and the centuries are obliterated. ... Some women are portrayed in dishabille, stretched in the mild winter sun like a kitten, and others in bedroom scenes. The description is 'near the bone' and leaves nothing ambiguous as far as frankness goes; it is sometimes startling in detail, and in its casual implications. No painter can paint a portrait with his eyes half-closed. Yet the Eve portrayed in these lyrics can remain naked and the beholder is not compelled to lower his eyelids.'[১০]

'ঋতুসংহারে'র হেমন্ত ও শিশির ঋতুদ্বয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে স্বর্গত পণ্ডিতের উপরি উদ্ধৃত মন্তব্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ কামিনীগণের দেহপ্রসাধন ও শৃঙ্গারকেলির আবরণলেশহীন বর্ণনায় ভরপুর। কালিদাস যে সত্যই শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্দ্ধাভিষিক্ত ছিলেন, তাহা ঋতুসংহারে এই দুইটি সর্গ পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবে কবির দৃষ্টি সর্বদাই উন্মুক্ত, উদার, সংকোচলেশশূন্য—প্রকৃতির শোভাবর্ণনাতে যেমন কোনও সংকোচ নাই, নারীর দেহশোভা ও শৃঙ্গারচেষ্টা-বর্ণনেও তেমনই কোনও গোপনীয়তার হেতু নাই। সেইজন্য 'ঋতুসংহার'কে সাধারণ pornography'র সহিত তুলনা করা সমীচীন হইবে না—'ঋতুসংহার' কামপ্রধান বটে, কিন্তু এই কাম সদ্য-উদ্ভিন্ন তারুণ্যের উচ্ছলিত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ডি. এইচ্. লরেন্সের কথায় বলিতে পারা যায়—"What is pornography to one man is the laughter of genius to another."[১১]

ষষ্ঠ সর্গে বাসন্তী প্রকৃতির বর্ণনাও বেশ মনোজ্ঞ। বসন্তাগমে বনভূমি যেন রক্তাংশুকসজ্জিতা নববধূর ন্যায় শোভা পাইতেছে—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈরপি পারিজাতৈঃ
সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে চ
রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥

কিংশুকবনরাজি কুসুমভারাবনত, দীপ্তবহ্নিশিখাসদৃশ কুসুমকোরকে পারিজাত-বৃক্ষরাজি পরিব্যাপ্ত ; মনে হইতেছে যেন বসন্তনায়কের অতর্কিত আবির্ভাবে আজ পৃথিবী রক্তাংশুকশোভিতা নববধূরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।[১২]

তির্যক্ প্রাণিজগতের মধ্যেও বসন্তের প্রভাব সুস্পষ্ট—

পুংস্কোকিলশ্চূতরসেন মত্তঃ
প্রিয়ামুখং চুম্বতি সাদরোঽয়ম্।
গুঞ্জদ্দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটুম্॥

চূতরসমত্ত পুংস্কোকিল সাদরে প্রিয়ার মুখ চুম্বন করিতেছে ; ভ্রমরও পদ্মকোরক-মধ্যে অবস্থান করতঃ মধুর গুঞ্জনধ্বনি করিয়া যেন প্রিয়ার চাটুরচনায় তৎপর হইয়াছে।[১৩]

ঋতুসংহার ও মন্দশোর শিলালেখ॥

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদের নানা সূক্তে বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে 'রামায়ণে' মহাকবি বাল্মীকির নিপুণ লেখনীতে বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত প্রভৃতি ঋতুর যে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, খুব সম্ভব কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রণয়নে তাহাই মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

A perusal of Mandasore inscriptions shows that description of seasons was a fashion among the poets in that part of the country. The inscription of 404 A.D. describes the rainy season ; the inscription of 423 describes the autumn ; the inscription of 437 describes the winter ; the inscriptions of 473 and 533 describe the spring. So in early youth Kalidasa caught the fancy of describing all the seasons and in no other part of India are the traditional six seasons so well defined and so well marked as in Western Malwa.

শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে কালিদাস ছিলেন পশ্চিম মালবের অন্তর্গত দশপুরের

অধিবাসী, এবং দশপুরের প্রাচীন শিলালেখসমূহে ঋতুবর্ণনের যে প্রথা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাই উদীয়মান কবিকে 'ঋতুসংহার' রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।[১৪] এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতবিদ্‌ ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ অধ্যাপক কীল্‌হর্নের মতেরও কতকটা মিল আছে—যদিও তাঁহার মতে কালিদাসই উত্তমর্ণ, তাঁহারই প্রভাবে দশপুরের শিলালেখসমূহে ঋতুবর্ণন প্রথার সূত্রপাত। বস্তুতঃ 'ঋতুসংহারে'র পঞ্চম সর্গে শিশিরবর্ণনের অন্তর্গত—

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং
হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ
প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্‌॥
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং
ন হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলম্‌।
ন বায়বঃ সান্দ্র-তুষার-শীতলা
জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্‌॥

এই দুইটি শ্লোকের সহিত বৎসভট্টির মন্দদশপুর প্রশস্তির অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলির বিশেষ সাজাত্য আছে—

রামাসনাথভবনোদর[১৫]-ভাস্করাংশু-
বহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে।
চন্দ্রাংশুহর্ম্যতলচন্দনতালবৃন্ত-
হারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে॥
রোধ্র-প্রিয়ঙ্গুতরু-কুন্দলতা-বিকোশ-
পুষ্পাসব-প্রমুদিতালিকলাভিরামে।
কালে তুষারকণকর্কশশীতবাত-
বেশপ্রবৃত্তলবলীনগনৈকশাখে॥
স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনা-বিপুলকান্তপীনোরু—
স্তনজঘনঘনালিঙ্গন-নির্ভৎসিততুহিনহিমপাতে॥

অধ্যাপক কীল্‌হর্নের মতে বৎসভট্টি প্রশস্তিতে শিশিরবর্ণনা ঋতুসংহারের শিশিরবর্ণনার দ্বারা অনুপ্রাণিত।[১৬] কালিদাসের কালনির্ণয় এখনও সন্দেহগ্রস্ত; অতএব কালিদাসই যে 'মন্দশোর'-প্রশস্তির নিকট ঋণী—এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। তবে কালিদাসের মৌলিকতা সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলা

চলিতে পারে যে, রামায়ণ-মহাভারতে অথবা বিভিন্ন শিলালেখে ঋতুবর্ণনের যে সকল নিদর্শন আমরা পাই, সেগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত। কালিদাস ছয়টি বিভিন্ন ঋতুকে কামাকুলচিত্ত তরুণের এক অভিন্ন নবীন দৃষ্টিকোণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে, কালিদাসের এই খণ্ডকাব্যে একটি বিশেষ অভিপ্রায় ছয়টি সর্গকে এক সংহতিসূত্রে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে।[১৭] প্রকৃতিবর্ণনা এই ক্ষুদ্র কাব্যটিতে আপাতদৃষ্টিতে মুখ্য বলিয়া মনে হইলেও, বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র দৃশ্যরাজির দ্বারা উদ্বুদ্ধ কামিজনের চিত্তবৃত্তির নিপুণ প্রতিফলনই যেন তরুণ কবির গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়।[১৮] রবীন্দ্রনাথ 'ঋতুসংহারে'র এই মূল বার্তাটিই তাঁহার 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দশপদী কবিতাটিতে অনুপম ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন-'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণরাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে। ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে। ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী—
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী॥

ঋতুসংহারের কাব্যোৎকর্ষ॥

স্বর্গত রণজিৎ পণ্ডিত তাঁহার 'ঋতুসংহারে'র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন—

Kalidasa is both a painter and a poet; the painter to whom

the world is a pageant and the poet for whom the world is a song.

কালিদাস তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীর মাধুর্য অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই অনুভূতি সংগীতের ন্যায় বিমোহিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। জড় ও চেতন জগতের উপর কোন্ ঋতুর কেমন প্রভাব, ইহা তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে 'মেঘদূতে' প্রকৃতিবর্ণনায় কালিদাস অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিকও বটে। কেননা, 'মেঘদূত' কালিদাসের পরিণত রচনা। 'ঋতুসংহারে' কবি যেন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি যেন একজন সুনিপুণ অথচ উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র—যেমন যেমন দৃশ্য দেখিতেছেন, তেমনই তিনি প্রিয়ার নিকট তাহার হুবহু বর্ণনা দিয়া চলিয়াছেন ; কবি তাঁহার নিজের সত্তা এখনও প্রকৃতিসত্তায় লীন করিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু 'মেঘদূতে' পূর্বমেঘে প্রকৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা পাই তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন কবি প্রকৃতির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"—ইহা শুধু কামোন্মত্ত যক্ষের মুখের কথা নহে ; উহা যেন কালিদাসের পরিণত কবিমানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে। 'মেঘদূতে', 'রঘুবংশে' বা 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে কবি সত্যই জড় ও চেতনের মধ্যে বিভেদ যেন বিস্মৃত হইয়াছেন। একজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—

It is hardly true to say that he (Kalidasa) personifies rivers and mountains and trees ; to him they have a conscious individuality as truly and as certainly as animals or men or gods. Fully to appreciate Kalidasa's poetry one must have spent some weeks at least among wild mountains and forests untouched by man ; there the conviction grows that trees and flowers are indeed individuals, fully conscious of a personal life and happy in that life.[১৯]

আর-এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, 'ঋতুসংহার' কালিদাসের কবি-প্রতিভার অপরিণত অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। কালিদাস শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্ধন্য—ইহা সত্য বটে ; কিন্তু তাঁহার পরিণত রচনায় বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকারগণের মতো, কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য সুনিপুণভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। 'শকুন্তলা'য় যৌনরতির এই দুইটি রূপ যেমন ভাবে কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আর

কোনও কাব্যে ততখানি সুন্দরভাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'মেঘদূত'—এই দুইটি রচনাকে বাদ দিলে, কালিদাস যে কাম ও প্রেমের পরস্পর বিভেদ সম্পর্কে অতিশয় জাগরূক ছিলেন, ইহা স্পষ্টতই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'ঋতুসংহারে' কামই প্রধান, রূপতৃষ্ণা ও ভোগস্পৃহাই নায়কের চিত্তের আর সব বৃত্তিকে যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে; প্রেমের উচ্চতর আদর্শ, সন্তানলাভে যাহার পরিপূর্ণতা, সে বিষয়ে কবি যেন এখনও সচেতন হইয়া উঠেন নাই। 'ঋতুসংহারে' কাম এখনও পার্থিব ভোগলালসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—উহা এখনও অপার্থিব প্রেমের স্তরে উন্নীত হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঋতুসংহারে কবিপ্রতিভার আর একটি বিশেষ ন্যূনতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইতেছে, ঋতুসংহারের মূল লক্ষ্যের সহিত কাব্যবস্তুর অসংগতি। প্রকৃতির উপর ঋতুচক্রের দৃশ্যমান প্রভাবের বর্ণনাই কবির মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারী ও প্রকৃতি কালিদাসের কবিদৃষ্টিতে মিশিয়া গিয়াছে। 'ঋতুসংহারে'ও তাই দুইয়েরই বর্ণনা আছে। প্রথম তিনটি সর্গে গ্রীষ্ম বর্ষা এবং শরতের বর্ণনায় নারী ও প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে একটি সুসঙ্গত ভারসাম্য আছে; কিন্তু পরবর্তী সর্গদ্বয়ে হেমন্ত ও শীত ঋতুদ্বয়ের বর্ণনায় নারীর শরীরশোভার ও বিলাসলীলার বর্ণনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে কবি যেন আর নবীনতার সন্ধান পাইতেছেন না। তরুণ কবিকে যেন হেমন্ত ও শীতের প্রসুপ্তকল্প মন্থর প্রকৃতি আর প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না, তাই তাঁহার দৃষ্টি নারীর দেহসুষমার দিকে নিবদ্ধ। সুতরাং গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির সচেতনতা সমান তীব্রতা ও নবীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা যেন ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এবং অন্তিম সর্গে বসন্তবর্ণনে আসিয়া তাহা যেন আপনার সমস্ত গতিবেগ ও সজীবতা নিঃশেষে ব্যয়িত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে—

The closing canto should have been the crown of the poem. But the poet's sin pursues him and, though we see a distinct effort to recover the old pure fervour, it is an effort that fails to sustain itself ··· The poem on Spring which should have been the finest, is the most disappointing in the whole series.

কিন্তু 'ঋতুসংহারে'র সকল ন্যূনতা সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই স্বল্পপরিসর খণ্ডকাব্যে এমন একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতি সম্বন্ধে

এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্য কোনও কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না এবং যাহা কেবল কালিদাসেরই পরবর্তী পরিণত রচনাবলীতে আমাদের অনুভবগোচর হইয়া থাকে— যদিও সে সুর এবং সে দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশঃ অধিকতর পরিশুদ্ধি ও গভীরতা অর্জন করিয়াছে।

১ তুলনীয় "In a MS. taken to China at some comparatively early date, and written, according to Dr. Nobel, about 1200 A. D., the scribe has copied out the beginnings of the *Kumarasambhava*, the *Meghaduta* and the *Raghuvamsa* and adds some obscure Aksaras which may possibly be read as *traya kavyah rsesa traya kavyam.* Hence it is deduced that the scribe desired to give the begnning of the Kavyas of Kalidasa and knew only three. The argument is really too preposterous to need refutation."—A. Berriedale Keith : *The Authenticity of the Ritusamhara* in *JRAS*, 1912, pp. 1066 ff.

২ *Kalidasa* : *Chronology of his Works and Learning*, (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. II, Pt. II, p. 184).

৩ *Sanskrit Literature*, p. 317.

৪ *Kalidasa*, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Second Edition, 1950, pp. 29-30.

'ঋতুসংহারে'র বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার সহিত তুলনায় 'মেঘদূতে'র বর্ষাবর্ণনা অনেক পরিণত। কিন্তু 'ঋতুসংহার' তাই বলিয়া কালিদাসের রচনা নহে, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা কবিত্বশক্তির অভিব্যক্তির সম্ভাবনাই মূলতঃ অস্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ডক্টর কীথের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"The difference between the *Eclogues* and *Georgics* of Vergil are much more marked, and yet their ascription to Vergil is in both cases beyond all doubt. Again, the poems of Catullus show a variety much greater than that found in the case of Kalidasa's poems."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1912*, p. 1069, foot-note 3.

৫ তুলনীয় 'ঋতুবর্ণনম্—রঘুবংশ-হরিবংশ-শিশুপালবধাদৌ'—অলঙ্কারতিলক, পৃ ১৬। অপিচ—'তত্র ঋতুবর্ণনে শরদ্-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি-বর্ণনানি সেতুবন্ধ-হরিবিজয়-রঘুবংশ-হরিবংশাদৌ'—অলংকার-চূড়ামণি, পৃ. ১৬।

৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু বলেন : "He begins with the summer because in Northern India the astronomers always began their year with the vernal equinox ushering in the hot season."—*JBORS*, Vol. II. 1916. পৃ. ১৭৯, রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'র 'কালবিভাগ' শীর্ষক অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'বর্ষাঋতু' হইতেই বর্ষগণনা লোকব্যবহারসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—"ষণ্ণামৃতূনাং পরিবর্তঃ সংবৎসরঃ। স চ চৈত্রাদিরিতি দৈবজ্ঞাঃ, শ্রাবণাদিরিতি লোকযাত্রাবিদঃ। তত্র নভা নভস্যশ্চ বর্ষাঃ . . "—কাব্যমীমাংসা, পৃ. ৯৮-৯৯ (Gaekwad Oriental Series Edn.)। 'কাব্যমীমাংসা'র উল্লিখিত-অধ্যায়ে ঋতুবর্ণনবিষয়ক অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, এবং 'ঋতুসংহারে'র সহিত সেগুলির ভাষা, ভাব ও বর্ণনপদ্ধতির দিক দিয়াও বেশ সাম্য আছে। ঋতুবর্ণন যে সংস্কৃত কবিগণের একটি বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল তাহা রাজশেখরের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে বুঝিতে পারা যায়—

"এক-দ্বি-ত্র্যাদিভেদেন সামস্ত্যেনাথবা ঋতূন্।
প্রবন্ধেষু নিবধ্নীয়াৎ ক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ বা॥"—কাব্যমীমাংসা, পৃ. ১১২

৭ *Kalidasa*, pp. 36-37.

৮ "In all eight varieties of metre are used in the six cantos of *Ritusamhara*. And some of the meaning is in the sound."—R. S. Pandit.

৯ দ্রষ্টব্য : "One thing is certain. The one great peculiarity of Kalidasa's early poetry is that he admires nature more ardently than the fair sex."—Haraprasad Sastri, *JBORS.*, Vol. II. 1916, p. 180.

১০ *Ritusamhara or The Pageant of Seasons.* Translated from the Original Sanskrit Lyrics of Kalidasa. By. R. S. Pandit. Bombay, 1947, p. 18.

১১ এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ; "His (Kalidasa's) sensuousness is not coupled with weak self-indulgence, but is rather a bold and royal spirit seizing the beauty and delight of earth to itself and compelling all the senses to minister to the enjoyments of the spirit rather than enslaving the spirit to do the will of the senses."—*Kalidasa*, p. 35.

১২ তুলনীয় : বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্॥—কুমারসম্ভব : ৩য় সর্গ।

১৩ তুলনীয় : মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥—কুমারসম্ভব : ঐ.

'ঋতুসংহারে' বসন্তবর্ণনার সহিত 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের আবির্ভাব-বর্ণনার বিশেষ সাজাত্য দেখা যায়। 'আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রাঃ সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধানাঃ। কুর্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং

সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্ ॥'—ঋতুসংহারের এই শ্লোকটির সহিত কুমারসম্ভবের—'অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি'—এই শ্লোকাংশটি তুলনীয়।

১৪ '*Kalidasa: Chronology of his Works and his Learning*' শীর্ষক প্রবন্ধেও শাস্ত্রি-মহাশয় লিখিয়াছেন—"Kalidasa passed his novitiat in writing the *Ritusamhara*. He was indeed induced to write on the seasons, because he found all round the country he inhabited, descriptions of seasons almost in every inscription. He thought perhaps it would be doing a service to his country, if he could describe all the seasons together. So he undertook to write the *Ritusamhara*"—*JBORS*. Vol. II. 1916, p. 179.

১৫ ফ্লীটের 'গুপ্তলেখমালা' (*Gupta Inscriptions*) নিবন্ধে 'রামাসনাথ-রচনে দর—' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু অধ্যাপক কীলহর্ন কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণে 'রামা-সনাথ-ভবনোদর—' এইরূপ পাঠই প্রস্তাবিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য: Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitat des Gottingen 1890.

১৬ "Prof. Kielhorn's point is, that the composer of the inscription must have had these verses running in his mind ; and consequently that the *Ritusamhara* must have been composed before A.D. 472. This seems likely enough. And we know already, from the Aihole Meguti inscription that the fame of Kalidasa, as also of Bharavi, was well established far to the South of Mandasor, before A.D. 634."—Notes and Queries : *Indian Antiquary*, Vol. XIX. p. 285.

১৭ তুলনীয় ; ছটা ঋতু পূর্ণ ক'রে ঘটিত মিলন স্তরে স্তরে
ছটি সর্গে বার্তা তাহার রইত কাব্যে গাঁথা।—'সেকাল' : রবীন্দ্রনাথ

১৮ তুলনীয় "The title is perhaps a little misleading, as the description is not objective, but deals with the feelings awakened by each season in a pair of young lovers. Indeed, the poem might be called a Lover's Calendar."—A. W. Ryder : *Kalidasa* (Translations of Shakuntala and other Works. Everyman's Library), p. 211.

১৯ A. W. Ryder : *Kalidasa*, Introduction, p. xix.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও কালিদাসের ব্যাখ্যা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে যে-সকল মনীষী বাংলাদেশকে ভারতের নেতৃপদবীতে উন্নীত করিয়াছিলেন, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মনীষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক। পাণ্ডিত্যের সহিত সাহিত্যিক প্রতিভার এই জাতীয় সমন্বয় ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে ভারতের বিস্মৃতপ্রায় অতীত নীরস পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা বিষয়ে অপূর্ব নিষ্ঠা ও আগ্রহ, এবং অপরদিকে সেইসব নীরস প্রত্নতত্ত্বের আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে একটি সংহত শিল্পকর্মরূপে শিক্ষিত পাঠকসমাজের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করা—শাস্ত্রিমহাশয়ের মনীষায় এই দুইটি বিরোধী বৃত্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। যে দুইজন বাঙালী মনীষীর আদর্শ তাঁহার প্রতিভার এই দুইটি বিজাতীয় রূপকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিল—তাঁহারা হইতেছেন যথাক্রমে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বঙ্গসাহিত্যের যুগপ্রবর্তক পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালার সাহিত্য' (বর্তমান শতাব্দীর)[১] শীর্ষক প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ইঁহার 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বাঙ্গলা দেশের সর্বপ্রধান সাময়িক পত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। ইনি 'বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি' ও 'স্কুল বুক সোসাইটি'র অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরাজী লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন। এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এজন্য আমরা দুঃখিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর কোন একজন লোক বা একটী সোসাইটি দ্বারা হয় নাই।"[২]

রবীন্দ্রনাথ 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা'র দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয়ের পাণ্ডিত্যের তুলনাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও ঐ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

"এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হ'য়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই

তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হ'য়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হ'য়ে উৎকর্ষলাভ ক'রেছিল।"

শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হইতেই যে রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কলাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য—উভয়েরই সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যের ও মনীষার যে শ্রমসাধ্য দিক্‌ তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের আদর্শেই যে বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।[৩]

শাস্ত্রিমহাশয়ের সাহিত্যিক প্রতিভার উপর বঙ্কিমের প্রভাব যে কিরূপ গভীর ছিল, তাহা শাস্ত্রিমহাশয় নিজেই তাঁহার রচনার বিভিন্ন স্থলে মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমেই শাস্ত্রিমহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হইবার সুযোগ পান। 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়'[৪] শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমের সহিত প্রথম পরিচয়ের সেই স্মৃতিকথা অনবদ্য ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কতদূর উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা তাঁহার ১২৮৫ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়—

"ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিবামাত্র ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল।···যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন, তাঁহাদের নাম বায়রণ, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিনজনই যুবকদিগের চিত্ত-আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে, শেষে তাঁহারা যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।"[৫]

সারস্বত আরাধনার সূচনাতেই একদিকে রাজেন্দ্রলালের মতো মনীষীর সহযোগিতা ও শিষ্যত্বলাভ এবং অপরদিকে 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্তরঙ্গতম লেখকগোষ্ঠীর অন্যতমরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরন্তর সংস্পর্শে আসা—সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়। হরপ্রসাদের সাহিত্য ও কর্মজীবনে তাহার ফলও হইয়াছিল দূরপ্রসারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রিমহাশয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহাদের মধ্যে একটি উল্লেখ-

যোগ্য অংশ কালিদাসের কাব্যসমালোচনা অধিকার করিয়া আছে।[৬] বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কালিদাসের কাব্যের অপূর্ব সুষমায় মুগ্ধ ছিলেন—ইহা তাঁহার রচনাবলী মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে সহজেই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রিমহাশয়ের নিজের উক্তিই উদ্ধারযোগ্য—

"কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে 'নৈষধ' পড়াইতে আরম্ভ করেন। 'নৈষধ' পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদিবা দুই একজন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি লইয়াই থাকিতেন।..."[৭]

শাস্ত্রিমহাশয়ের কালিদাস-কাব্য-সমালোচনাতেও কাব্যাংশের আলোচনাই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাধর পুরুষের সহিত সম্পর্ক এবং শিরোমণিমহাশয়ের পাঠনপ্রণালী যে তাঁহার সমালোচনা-শৈলীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

॥ দুই ॥

শাস্ত্রিমহাশয় বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় কালিদাস সম্পর্কে যে-সকল প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেগুলির সংখ্যা প্রায় ত্রিশের উপর হইবে। তন্মধ্যে বাংলা-ভাষায় রচিত প্রবন্ধরাজির অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছিল 'বঙ্গদর্শন' ও 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। নিম্নে প্রবন্ধগুলির নামোল্লেখ করা গেল—

১। কালিদাস ও সেক্ষপীয়র (বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ বৈশাখ)
২। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি (ঐ, পৌষ)
৩। মেঘদূত [সমালোচনা] (ঐ, ১২৮৯ ফাল্গুন)
৪। রঘুবংশ (ঐ, ১২৯০ কার্তিক—পৌষ)
৫। কালিদাসের মেয়ে দেখান (নারায়ণ, ১৩২২ ভাদ্র)
৬। কালিদাসের বসন্তবর্ণনা (ঐ, ফাল্গুন ১৩২৩)
৭। ইরাবতী (ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

৮। পার্বতীর প্রণয় (ঐ, আষাঢ় ১৩২৩)
৯। উর্বশী-বিদায় (ঐ, ১৩২৩ ফাল্গুন)
১০। বিরহে পাগল (ঐ, ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ)
১১। কোমলে কঠোর (ঐ, ১৩২৪ আষাঢ়)
১২। কণ্বের কোমল মূর্তি (ঐ, ১৩২৪ শ্রাবণ)
১৩। কণ্বের কঠোর মূর্তি (ঐ, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক)
১৪। শকুন্তলার মা (ঐ, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক)
১৫। দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য (ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩২৪)
১৬। দুর্বাসার শাপ (ঐ, পৌষ ১৩২৪)
১৭। শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী (ঐ, মাঘ ১৩২৪)
১৮। এক এক রাজার তিন তিন রাণী (ঐ, ফাল্গুন ১৩২৪)
১৯। অগ্নিমিত্রের ভাঁড় (ঐ, বৈশাখ ১৩২৫)
২০। কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ (ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)
২১। রঘুবংশের গাঁথুনি (ঐ, ১৩২৫ শ্রাবণ)
২২। রঘুতে নারায়ণ (নারায়ণ, ভাদ্র ১৩২৫)
২৩। রঘু আগে কি কুমার আগে ? (ঐ, আশ্বিন ১৩২৫)
২৪। অজবিলাপ ও রতিবিলাপ (ঐ, কার্তিক ১৩২৫)
২৫। রঘুকাব্য বড় কিসে ? (ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩২৫)
২৬। রঘুবংশে বাল্যলীলা (ঐ, পৌষ ১৩২৫)
২৭। রামের ছেলেবেলা (ঐ, ফাল্গুন ১৩২৫)
২৮। রঘুবংশে প্রেম (ঐ, চৈত্র ১৩২৫)
২৯। রঘুবংশে প্রেম—বিরহ (ঐ, জৈষ্ঠ ১৩২৬)
৩০। কালিদাসের অভিধান (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৬)

এই প্রসঙ্গে 'মেঘদূত' সম্বন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় যে ব্যাখ্যাপুস্তক স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা অল্প হইলেও, গুরুত্বের দিক দিয়া ন্যূন নহে। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি *Malavikagnimitra* নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তদ্ভিন্ন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের প্রাচ্যবিদ্যা-গবেষণাকেন্দ্রের মুখপত্রে (*Journal of the Bihar & Orissa Research Society*) ১৯১৫-১৬ খ্রীঃ তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—(১) Kālidāsa—His Home (*JBORS*, 1915, pp. 197-212) ; (২) Kāli-

dāsa—His Age (*JBORS*, 1916, pp. 31-44) ; এবং (৩) Kālidāsa—Chronology of His Works and His Learning (*JBORS*, 1916, pp. 179-189).

॥ তিন ॥

উপরে শাস্ত্রিমহাশয়ের কালিদাস-সম্পর্কিত রচনাবলীর যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজাইলে আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। ডঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার হরপ্রসাদের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়মূলক প্রবন্ধে পূর্বোল্লিখিত রচনারাজিকে নিম্নোদ্ধৃত কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—[১] Kālidāsa and Shakespeare ; [২] The beautiful features of Kālidāsa's heroines ; [৩] The exposition of the *Meghaduta* ; [৪] The Chronology of Kālidāsa's works ; [৫] The treatment of love by Kālidāsa ; [৬] Kālidāsa's home ; এবং [৭] Kālidāsa's age. সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই শ্রেণীকরণ খুব সুপরিকল্পিত নহে। আমরা অন্য এক ভাবে শাস্ত্রি-মহাশয়ের রচনাবলীকে সাজাইবার চেষ্টা করিতে পারি। তাহাতে অবশ্যই রচনার কালানুক্রম রক্ষিত হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টিতে কালিদাসের জীবন ও কাব্য কিরূপ অখণ্ডভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে আমাদের প্রস্তাবিত শ্রেণীকরণ অধিকতর উপযোগী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শাস্ত্রি-মহাশয় ১৯১৫-১৯১৬ খ্রীঃ *JBORS* পত্রিকায় যে তিনটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা দিয়াই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। কেননা, কোনোও কবির কাব্য বিচার করিবার পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব-কাল এবং জন্মস্থান সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা অবশ্য করণীয়। ইহা ছাড়া, তাঁহার রচনাবলীর কালানুক্রমিক ইতিহাস নির্ণয়ও বিশেষভাবে কর্তব্য। শাস্ত্রি-মহাশয়ের উক্ত তিনটি প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্যসমালোচনার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনের এই সুচিন্তিত চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই তিনটি আলোচনাকেই নিছক কাব্যালোচনারূপে না দেখিয়া, প্রধানতঃ কবির জীবনীসংক্রান্ত আলোচনা-রূপে নির্দেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির জীবনী এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন যে, হরপ্রসাদের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদের লেখনী হইতে প্রসূত এই কয়টি আলোচনার মূল্য নেহাত স্বল্প নহে।

৪

কালিদাসের জন্মস্থান-সম্পর্কে এপর্যন্ত বহু আলোচনাই হইয়াছে। হোমরের তিরোভাবের পর যেমন গ্রীসের সাতটি ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহাকে সন্তানরূপে পাইবার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের অধিবাসিবৃন্দও তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকবিকে আপনারই স্বদেশবাসী বলিয়া দাবী করিয়াছে। একসময়ে বঙ্গবাসিগণ, কালিদাস যে বাঙালী ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; কোনও কোনও কাশ্মীরীয় পণ্ডিত কালিদাসের কাব্য হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, যে কাশ্মীরই তাঁহার জন্মভূমি; আবার মহাকবি যে দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ জনপদের অধিবাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আবিষ্কার করাও আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে।[৮] শাস্ত্রিমহাশয়ের যুগে কালিদাসকে বাঙালী বলিয়া দাবী করিবার দিকে এক অদ্ভুত ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু, তিনি এই সংকীর্ণ স্বজাতি-অভিমানকে আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই। কালিদাস যে অঞ্চলেই আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কবি—ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। তাই সর্বপ্রকার স্বজাতি মোহ বিসর্জন করিয়া তিনি কালিদাসের বাসস্থান নির্ণয়ের জন্য প্রবৃত্ত হন। মহাকবির 'মেঘদূত' এবং 'ঋতুসংহার'—এই দুইখানি খণ্ডকাব্য তাঁহার এই গবেষণাকার্যে বিশেষভাবে সহায় হইয়াছিল। 'মেঘদূতে' রামগিরি হইতে অলকা-গামী পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সেই ভৌগোলিক বিবরণের সাক্ষ্য হইতে শাস্ত্রিমহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিন্ধ্যের উত্তরাঞ্চলে বিস্তৃত মালক্ষেত্রের প্রতিই কালিদাস যেন বিশেষ পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। ("...his partiality for the country immediately to the North of the Vindhyas, what is at present known as Malwa and what Kalidasa describes as Malaksetra or the highlands of the Vindhyas.") শুধু পুঁথির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি একাধিকবার উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন, এবং সেখানকার নদী, পর্বত, প্রাচীন দেবমন্দির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বস্তুর সহিত অপরোক্ষ পরিচয়লাভ করিয়াছিলেন। মেঘদূতের ৩৩-সংখ্যক শ্লোকে যে 'গন্ধবতী'র তীরস্থিত 'চণ্ডেশ্বর' শিবধামের উল্লেখ আছে, সেই 'গন্ধবতী'কে শাস্ত্রিমহাশয় কি অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন?—

"I had to go twice to Ujjain and dive into the Ujjain Maha-

tmyas, before I could discover that what was a beautiful small stream in Kalidasa's time is now a drain running through the heart of the modern city."

মেঘদূতের ৪২-৪৩ শ্লোকে আমরা 'দেবগিরি' নামক পর্বত এবং তদুপরি দেব-সেনাপতি 'স্কন্দে'র নিকেতনের বর্ণনা পাই। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় লিখিয়াছেন—

"The hill is still there and the deity is still there worshipped by the Ahirs, as *Khanderao* which in Sanskrit would be *Skanda-raja*, and it is strange that Kalidasa should name this deity as *Skanda.*"

'মেঘদূতে' যদিও কালিদাস 'শ্রীবিশালা' 'বিশালা' বা 'উজ্জয়িনী'র স্বর্গীয় সৌন্দর্য অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন বটে, এবং অধিকাংশ পণ্ডিতই ইহার দ্বারা উজ্জয়িনীই কালিদাসের প্রকৃত নিবাসরূপে কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে 'দশপুরে'র বর্ণনায় মহাকবির উক্ত ভূভাগের অধিবাসিগণের সহিত যেরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয় সূচিত হইয়াছে, তাহাতে কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া পরিগণিত হইবার গৌরব 'দশপুরে'রই প্রাপ্য।—"This description (*viz.*, of Dasapura show a more intimate acquaintance with this part of the country than with the rest of Malwa···his native city was either Dasapura or some place near it."

পশ্চিম মালবের ভূভাগের বিচিত্র সংস্থানের সহিতই যে মহাকবির বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাহাই নহে, তাঁহার 'ঋতুসংহার' কাব্যের ঋতুবর্ণনপদ্ধতিও এই মন্দশোর অঞ্চলেরই প্রাচীন শিলালেখসমূহে অনুসৃত ঋতু-বর্ণনপদ্ধতির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল—এইরূপ অনুমানও যে নিতান্ত অসমীচীন নহে, তাহা শাস্ত্রিমহাশয়ই সর্বপ্রথম আমাদের সমক্ষে উদঘাটিত করেন—

"A perusal of the Mandasore inscriptions shows that description of seasons was a fashion among the poets in that part of the country. The inscription of 404 A.D. describes the rainy season; the inscription of 423 describes the autumn ; the inscription of 437 describes the winter ; the inscriptions of 473 and 533 describe the spring. So in early youth Kalidasa caught the fancy of describing all the seasons and in no other part of

India are the traditional six seasons so well defined and so well marked as in Western Malwa."

'ঋতুসংহারে' কালিদাস যে-সকল উদ্ভিদ্, পুষ্প প্রভৃতি (যেমন শ্যামা, প্রিয়ঙ্গু, কঙ্কেলী) প্রাকৃতিক বস্তু উল্লেখ করিয়াছেন, শাস্ত্রিমহাশয় তাহার একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন, এবং প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একমাত্র পশ্চিম মালবের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঐসকল উদ্ভিদ্ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে। সুতরাং মহাকবি যে ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন এবং সেইজন্যই তত্রত্য ভৌগোলিক সন্নিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও ষড়্ঋতুর বিচিত্র ঐশ্বর্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল সে বিষয়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের মনে কোনও সন্দেহই ছিল না—

"...the fact that all the natural objects mentioned in the *Ritusamhara* are to be found together only in one district of India and that is, Western Malwa and nowhere else."

মন্দশোর শিলালেখসমূহের সহিত 'ঋতুসংহার' কাব্যের বর্ণনাভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য হইতেই শাস্ত্রিমহাশয় কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও একটি সুস্পষ্ট ধারণায় উপস্থিত হন। তাঁহার মতে কালিদাস খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৪০৪ অব্দ হইতে ৫৩৩ অব্দ—এই দুই সীমার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[১]

৫

'Kalidasa—Chronology of His Works and His Learning' প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় কালিদাসের রচনাবলীর তুলনামূলক আলোচনাকে ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতঃ মহাকবির বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা ও বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গীর ক্রমপরিণতির ধারা নিরূপণ করিবার প্রয়াস করেন। প্রবন্ধটিতে তাঁহার প্রৌঢ় ঐতিহাসিক বুদ্ধিরই যে শুধু নিদর্শন মিলে, তাহা নহে; কবিমানস সম্পর্কে তাঁহার উপলব্ধির গভীরতা এবং পরিচ্ছন্ন সাহিত্য-রুচিরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে 'ঋতুসংহার'ই কালিদাসের সর্বপ্রথম রচনা। ইহাতে তাঁহার রচনাভঙ্গী যেমন পুনরুক্ত-দোষদুষ্ট, সেইরূপ তাঁহার অভিজ্ঞতাও নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এখনও তিনি তাঁহার জন্মভূমি মন্দ-দশপুরের (শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে) সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই—সেই সংকীর্ণ জনপদের বিচিত্র ভূসন্নিবেশ,

বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র আবর্তন এবং বৃক্ষলতা পুষ্প প্রভৃতির সৌন্দর্যেই তিনি মুগ্ধ। তাহারও বাহিরে, চতুষ্পার্শ্বে যে কত অজ্ঞাত দেশ, কত অপরিচিত নগরী ও রাজধানী, কত অগণিত পর্বত ও নদী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে,—কবি যেন এপর্যন্ত তাহাদের অস্তিত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্রব্যকাব্যরচনায় এই প্রথম প্রয়াসে উত্তীর্ণ হইয়া নবীন কবি দৃশ্যকাব্যরচনার কঠিনতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিরূপ সংকোচের সহিত মহাকবি সাহিত্যের এই নূতন ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনাংশে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনেই পরিস্ফুট।[১০] এখানেও কালিদাস জন্মভূমি মালবের বিগত গৌরবময় ইতিহাসের এক অধ্যায়কে নাট্যরূপ দান করিবার প্রয়াস করিয়াছেন—নায়িকা 'মালবিকা'র নামকরণ হইতেই কালিদাসের জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ সূচিত হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কালিদাসের দেশপ্রেম-মূলক নাটক (a patriotic drama)। কিন্তু কালিদাসের কবিমানস ইহার পর যেন হঠাৎ পক্ষবিস্তার করিয়া কল্পনা ও অভিজ্ঞতার অসীম গগনে পাড়ি দিতে চাহিল। 'মেঘদূতে' কালিদাসের অভিজ্ঞতা কিরূপে এতখানি তথ্যসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিল, কল্পনার সহিত বাস্তবের এই অপরূপ মৈত্রী বন্ধন কালিদাসের কবিমানসে কি ভাবে সংঘটিত হইতে পারিল, তাহা আমাদের নিকট পরম বিস্ময়স্থল। 'মেঘদূতে' কালিদাস আর জন্মভূমি মালবের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নহেন—"The horizon of his travels expands and he goes beyond the boundary of Malwa in his *Meghaduta*. He commences from a point beyond the eastern boundaries of Malwa, goes round it, entering it in the east touching various places of interest and goes far beyond it in the north."[১১]

কিন্তু কবিচিত্ত ইহাতেও যেন অতৃপ্ত ; শুধুই প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যরাশি বর্ণনা করিয়াই তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অপার ও অতল, গূঢ় ও গহন মানবমনের অনন্তলীলা, অসীম চিত্তমহাসমুদ্রের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ ও অনন্ত রত্নরাজি যদি তাঁহার কবিদৃষ্টিকে এড়াইয়া যায়, তবে তো তাঁহার প্রতিভা ব্যর্থ। কিন্তু মানবচরিত্র সম্পর্কে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা তো এখনও নিতান্তই পরিমিত! তাই মহাকবি দিব্য নায়কনায়িকার প্রেমলীলাকেই অবলম্বন করিয়া নূতন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিলেন। ইতঃপূর্বে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকেও কবি নায়কনায়িকার

প্রেমকেই তাঁহার কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রেমের গভীরতা তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। তাহা নিতান্তই মিলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রেমের পরিপূর্ণ রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলে, তাহাকে শুধু সম্ভোগ-মিলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিলেই চলিবে না, বিরহ-বিপ্রলম্ভের বন্ধুর পথে প্রবহমান প্রণয়স্রোতই দুর্নিবার গতিবেগ অর্জনে সমর্থ হয়। তাই মিলনসুখের সহিত বিরহদুঃখের মিশ্রণে প্রেমের বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মহাকবি যত্নশীল হইলেন। ইহারই ফলে জন্মলাভ করিল 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটক। কিন্তু 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে পুরূরবা ও উর্বশীর প্রণয়লীলা 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের তুলনায় গভীর হইলেও, তাহা এখনও নিছক প্রেমোন্মাদ বা passion মাত্র, উহা দেহলোলুপতারই নামান্তর। শাস্ত্রিমহাশয়ের ভাষায়—

"A change comes over the spirit of his poetry. He goes deep into the nature of things and human passions, and human sufferings interest him not. He goes to the *Vedas* for his heroes and picks up divine or semi-divine beings for the theme of his poetry, and produces his second drama the *Vikramorvasi* on the stage. The scenes are changed from earth to heaven as the celestial predominated over the terrestrial. But his love is still a passion and his admiration of nature no less ardent."

'বিক্রমোর্বশীয়' রচনার পর কালিদাসের কবিমানসে আবার এক নূতন পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। এপর্যন্ত কালিদাস যে-সকল কাব্য-নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনায় কবির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, নায়ক-নায়িকার প্রণয়লীলাকীর্তনে তাঁহার অনুভূতির গভীরতা ও সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ প্রকট হইয়াছে, কিন্তু অতিরিক্ত কোনও গভীর ভাব অভিব্যক্ত হয় নাই। এখনও কালিদাসের চিত্তে ধর্মবোধ প্রবল হইয়া উঠে নাই—এখনও তাহা নিতান্তই গৌণভাবে বিরাজ করিতেছে। ধর্মের সহিত প্রেম, প্রেমের সহিত ভক্তি মিলিত হইলে, তাহার ঐশ্বর্য ও গভীরতা কিরূপ বৃদ্ধি পায়, তাহারই নিদর্শনরূপে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' চিরভাস্বর হইয়া থাকিবে। এখানে মহাকবি প্রেমের নিকট কামের পরাজয় ঘোষণা করিয়া নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কে তাঁহার পরিণত উপলব্ধির সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রিমহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—

"Another change comes over the spirit of his poetry···He seeks

solace in devotion and his religion becomes Saiva. ···He atones for devoting long years of youth in the description of ardent and passionate love for the female sex by reducing Kama the embodiment of passions into ashes. Henceforth his love is an absolutely divine sentiment and no passion."

কিন্তু দিব্য নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন বর্ণনা করিয়াও কবির আশা মিটিল না। মানবের সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদ্, মহিমা ও দৈন্য তিনি যতক্ষণ না নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহার লক্ষ্য অসিদ্ধই থাকিয়া যাইবে। তাই পরিণতবয়সে তিনি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' দৃশ্যকাব্যে ও 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে মর্তমানবের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। সত্য বটে, শকুন্তলা অপ্সরঃসম্ভবা, সত্য বটে, 'শকুন্তলা'য় প্রথম অঙ্কে কণ্বাশ্রম হইতে সপ্তম অঙ্কে মারীচাশ্রম পর্যন্ত নাটকীয় দৃশ্যপট প্রসারিত হইয়াছে ; কিন্তু শকুন্তলায় দিব্য-মর্ত্যের সংমিশ্রণ ঘটিলেও, ইহার মূল আকর্ষণ মানবীয় আকর্ষণই। প্রথম অঙ্কে আলবাল-সেচনরতা সখীগণের পরস্পর বিশ্রম্ভালাভ স্মরণ করিলে, চতুর্থ অঙ্কে কণ্বাশ্রম হইতে বিদায়ের করুণ দৃশ্যের কথা চিন্তা করিলে, পঞ্চম অঙ্কে শার্ঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতমীপরিবৃতা অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলার প্রতি মহারাজ দুষ্যন্তের তীব্র কটাক্ষ ও তদুত্তরে শকুন্তলার দৃপ্ত ভর্ৎসনাবাণীর কথা স্মরণ করিলে, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের মানবীয় আবেদন সম্পর্কে আমাদের মনে আর কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না। 'রঘুবংশে' কালিদাস শুধু মর্ত-রাজকুলেরই বিচিত্র পরিণতি অঙ্কন করিয়াছেন। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ইক্ষ্বাকুবংশীয় শাসকগণের বিচিত্র মানবলীলার বর্ণনায় পরিণতপ্রজ্ঞ মহাকবির লেখনী ত্বরিতগতিতে সর্গ হইতে সর্গান্তরে অগ্রসর হইয়া ছুটিয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে ইহাই কালিদাসের কাব্যরচনার আনুমানিক ক্রম। বাহ্যপ্রকৃতি হইতে মানব-প্রকৃতি অভিমুখে, স্বর্গ হইতে মর্ত অভিমুখে, দেবতা হইতে মানব অভিমুখে কবি-দৃষ্টির ক্রমিক আবর্তন কালিদাসের রচনাবলীতে প্রতিফলিত হইয়াছে—

'This is the order in which Kalidasa's works were written and this order shows the gradual development of his mind. From the fanciful appreciation of nature he rose by steps, well-marked and well-defined to the highest conception of Godhead and the highest conception of the relation in which man stands to

his creator."

কালিদাসের রচনার এই ক্রমনির্ণয় শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার বাংলা-প্রবন্ধের স্থানে স্থানেও করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'কালিদাসের বসন্তবর্ণনা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্য। কালিদাসের প্রকৃতিবর্ণনা ও নারীর রূপবর্ণনা কিভাবে ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রিমহাশয় এই প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত-বর্ণনা করিয়াছেন। ১ম, ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গে। ২য়, মালবিকাগ্নিমিত্রের ৩য় অঙ্কে। ৩য়, কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে, সেটি অকালবসন্ত। ৪র্থ, রঘুবংশের নবম সর্গে। বর্ণনা ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনা ক্রমেই ছোট হইয়া আসিয়াছে, ক্রমেই বাজে জিনিস ছাঁটা পড়িয়াছে। জিনিসগুলি ক্রমেই বেশী করিয়া ফুটিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা আরও দেখিবেন, ভাষা ক্রমে মধুর হইতে মধুরতর ও মধুরতম হইয়া গিয়াছে। ছন্দে সুরও মধুরতর মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে।...

"কালিদাস অল্পবয়সে এমন কি তাঁহার পড়িবার সময়েই ঋতুসংহার লিখেন। তাঁহার যেদেশে বাড়ী, সেদেশের কবিদের ঋতুবর্ণনা একটা রোগ ছিল। লোকে শিলালেখ লিখে, কোন ধর্ম করিলে তাহার স্মরণার্থ। শিলালেখ লিখিলেই তাহাতে তারিখ দিতে হয়, প্রথম বৎসর, তাহার পর মাস, তাহার পর মাসের দিন। কালিদাসের দেশের কবিরা তারিখ দিতে গিয়া সেই ফাঁকে একটু ঋতুবর্ণনা করিতেন। আমরা খ্রীঃ ৪০৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীঃ ৫৩৩ পর্যন্ত যতগুলি শিলালেখ পাইয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই ঋতুবর্ণনা। কালিদাস সেই দেশেরই লোক, তিনিই বা ছাড়িবেন কেন, সমস্ত ঋতুগুলির বর্ণনা লইয়া তিনিও একখানি বই লিখিলেন। অন্য ঋতুর বর্ণনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই আমরা বসন্ত ঋতুর কথাই বলিব।

"পূর্বেই বলিয়াছি, ঋতুসংহারে যেমনটি দেখা, তেমনই লেখা—দেখাও তাঁহার নিজের বাড়ীর কাছে। এখনও তাঁহার হাত পাকে নাই, তিনি নবিস্ মাত্র। দেশের রোগও তিনি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই, ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনায় তিনি অতিমুক্তলতার খুব জাঁকাল বর্ণনা করিয়াছেন। এই লতা মাধবীলতার মত। বিশেষের মধ্যে এই, রাত্রি ৪টার সময় ফুটিয়া অতিমুক্ত বেলা ৮টার মধ্যেই ঝরিয়া যায়, তাই এ'র নাম অতিমুক্তলতা। মালবের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইহা দেখা যায়। কালিদাস বসন্তবর্ণনায় ঋতুসংহারেই অতিমুক্তলতার বর্ণনা

করিয়াছেন। তাঁহার কুমার, রঘু কি মালবিকাগ্নিমিত্র—ইহার কোনটিতেই অতিমুক্তলতা নাই। মালবিকা পূর্ব-মালবের জিনিস, কালিদাস সেখানেও অতিমুক্তলতার বর্ণনা করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম, কালিদাস নিজের বাড়ী বসিয়াই যেমনটি দেখিয়াছিলেন তেমনই লিখিয়াছেন।

"ঋতুসংহারে হেমন্তবর্ণনায় কালিদাস প্রিয়ঙ্গুর নাম করিয়াছেন। প্রিয়ঙ্গু তাঁহার দেশে জন্মিত। বর্ষায় গাছ হইত, শরতে উহার খুব শ্রীবৃদ্ধি হইত, প্রতি ডালে আগাগোড়া ফুল ফুটিত, ডাল উচা হইয়া থাকিত, ঠিক যেন স্ত্রীলোকের একখানি হাত -আগাগোড়া গহনাপরা। হেমন্তে গাছ শুকাইয়া যাইত, পাতা হলুদবর্ণ হইয়া যাইত, বোধ হইত যেন প্রিয়বিরহেই শুকাইয়া যাইতেছে। প্রিয়ঙ্গু কালিদাসের দেশে যথেষ্ট হইত, তাই তিনি বসন্তকালেও উহাকে ভুলিতে পারেন নাই। বসন্তবর্ণনায় তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকেরা প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক ও কুঙ্কুম ঘষিয়া স্তনে লেপ দিতেছে।

"তাঁহার হাত যে এখনও পাকে নাই, তাহার এই, তিনি বসন্তে কুন্দফুলের খুব বর্ণনা করিয়াছেন। ঋতুসংহারে তিনি বলিতেছেন, কুন্দফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। কুন্দলতা কিন্তু বসন্তে বাগান আলো করার মত কখনই ফুটে না, শীতেই এইরূপ হয়। তাই তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রে কথাটা সারিয়া লইয়া বলিলেন—মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা॥ কুমারসম্ভব কি রঘুবংশে উহার নামও করিলেন না।

...

"ক্রমশঃ বসন্তবর্ণনায় কালিদাসের কেমন হাত পাকিয়া উঠিল, তাহাই তুলনা করিয়া দেখাইব।...

ঋঃ সং 'পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ—'

কুঃ সং 'চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ'

রঃ বং 'ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈঃ—'

"কোকিল আর ভ্রমর উভয়ে মিলিয়া মধুরস্বরে কুলবতীর মন উচাটন করিয়া দিল। এটি নিশ্চয়ই প্রথম বয়সের লেখা। অধিকবয়সে কালিদাস বুঝিলেন, মন উচাটন কোকিলের স্বরে যেমনটি হয়, তেমনটি ভ্রমরের স্বরে হয় না। তাই কুমারসম্ভবে কালিদাস ভ্রমরকে ছাঁটিয়া ফেলিলেন। কোকিলের কূজনেই মানিনীর মানভঞ্জন করিয়া দিল। কিন্তু কি কথায় মানভঞ্জন হইল, তাহা এখানে বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। সেকথাটি রঘুবংশে প্রকাশ পাইল। যখন রঘুবংশ লেখা হয়, তখন কালিদাসের বয়স অনেক গড়াইয়া গিয়াছে। কারণ অল্প বয়সে,

এমন কি চল্লিশের পূর্বে 'চতুর বয়স একবার গেলে আর ফিরিবার নয়' একথা কাহারও মনেই আসে না। অনেকে নাক সিটকাইয়া বলিবেন, 'ছিঃ, মানভঞ্জনের কথায় বৈরাগ্যের কথাটা তুলা ভাল হইয়াছে কি?' তাহার উত্তর এই যে মান-ভঞ্জন দরকার, তা 'যেন তেন প্রকারেণ'। এইরূপ তুলনায় কিরূপে ক্রমে ক্রমে কালিদাসের হাত পাকিয়াছিল, আমরা তাহার উদাহরণ দিলাম।"

মনে রাখা আবশ্যক, উদ্ধৃত অংশটি শেষের দিকে শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রঘুবংশই কালিদাসের যৌবনের রচনা, কুমারসম্ভব পরিণত বয়সের।[১৭]

নারী-সৌন্দর্য বিষয়ে কবির দৃষ্টিও কি ভাবে ধাপে ধাপে পরিণতির স্তরে উত্তীর্ণ হইযাছে, তাহাও শাস্ত্রিমহাশয় নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান—

"স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য সম্বন্ধেও কালিদাসের হাত ক্রমে পাকিয়াছে। ঋতুসংহারে তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যই বর্ণনা করেন নাই। বসন্তে যেমন ফুল ফুটে, কোকিল ডাকে, ভ্রমর ভ্রমরী একসঙ্গে বেড়ায়, যেমনটি স্বভাবে দেখা যায়, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্বভাববর্ণনা মাত্র। তাহারা মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরে। কুসুমফুলের রঙে কাপড় ছোপায়, অঙ্গরাগ করে, চন্দ্রহার পরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মালবিকাগ্নিমিত্রেই প্রথম স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের সহিত স্বভাব-সৌন্দর্যের তুলনা দেখা যায়। এ তুলনায় স্বভাবের সৌন্দর্যই বড়, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য তাহার কাছে লাগে না। স্বভাবকবি এখনও স্বভাব লইয়াই মত্ত—স্ত্রীলোকের শোভা তাঁহার মনে ধরে না। কুমারসম্ভবে আর একটি ঘোর পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে স্বভাবের শোভা ও স্ত্রীলোকের শোভায় খুব একটা মিশামিশিভাব। কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট, কবি এখন ধোঁকায় পড়িয়াছেন।…

"আবার পটপরিবর্তন কর। রঘুবংশে দেখ সমস্ত স্বভাব স্ত্রীলোকের নিকট সৌন্দর্য শিক্ষা করিতেছে—কেহ বা অভিনয়, কেহ বা তাল দেওয়া শিখিতেছে। এখানে স্ত্রীসৌন্দর্যই প্রধান, স্বভাব-সৌন্দর্য তাহার পশ্চাত। এতদিন স্ত্রীসৌন্দর্য উপমেয় ছিল, স্বভাব-সৌন্দর্য উপমান ছিল। এখন স্বভাব-সৌন্দর্য হইল উপমেয়, আর স্ত্রী-সৌন্দর্য উপমান।

"এই এক বসন্ত-বর্ণনার তুলনা করিয়াই আমাদের বেশ বোধ হয় যে, কালিদাস অতি অল্প বয়সেই ঋতুসংহার লিখিয়াছিলেন; তাহার পর স্বভাব সৌন্দর্যে মাতিয়া মালবিকাগ্নিমিত্র বাহির করেন; ক্রমে, হয়ত বিবাহের পর, মেঘদূতে স্ত্রীলোকের

সৌন্দর্য লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন ; বয়স পাকিয়া আসিলে কুমারসম্ভবে স্বভাব-সৌন্দর্য ও স্ত্রীসৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করেন, এবং শেষ বয়সে, রঘুবংশে স্বভাব-সৌন্দর্যের উপর স্ত্রীসৌন্দর্য দাঁড় করাইয়া দেখাইলেন।"

'রঘুবংশ' যে কালিদাসের পরিণত লেখনীর ফল, সে-বিষয়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের ধারণা অতিশয় দৃঢ় ছিল। তাই তাঁহার আর এক প্রবন্ধে 'রঘুবংশ'ই যে কালিদাসের শেষ লেখা তাহা অন্যভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসের বিভিন্ন রচনাবলীর মঙ্গলাচরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শাস্ত্রিমহাশয় দেখান—

"কালিদাসের ঋতুসংহারে মঙ্গলাচরণ নাই, কুমারসম্ভবে মঙ্গলাচরণ নাই, মেঘদূতেও মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু রঘুবংশে মঙ্গলাচরণ আছে। রঘুবংশ লিখিবার সময় কালিদাসের ধর্মবুদ্ধি গভীর ও প্রবল হইয়াছিল। কোনও গ্রন্থে কালিদাস, আমি যে একান্ত অকিঞ্চন, এ ভাব প্রকাশ করেন নাই। কেবল শকুন্তলা ও রঘুবংশে করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলায় লিখিয়াছেন :—

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥

রঘুবংশে লিখিয়াছেন :—

ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ—স্বত্রস্তেবাস্তি মে গতিঃ ॥ [১।২-৪]

"এই বিনয়পূর্ণ বাক্যদ্বয়ের মধ্যেও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রথম বাক্যটি যদিও বিনয়পূর্ণ, কিন্তু তথাপি আমি যে শিক্ষিত এই অভিমানটি সম্পূর্ণ আছে। ইহা বহুদর্শিতার অভাবের ফল। দ্বিতীয়টিতে এরূপ অভিমানের লেশমাত্রও নাই, তাহার প্রতি অক্ষরে বলিতেছে যে আমি নিতান্ত অকিঞ্চন। যেন লেখক স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বকবিরা তাঁহা অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় কিছুই নহেন। এত বিনয়, এত অভিমানশূন্যতা যতদিন বয়স থাকে, ততদিন হয় না। কালিদাস এই কয়টি কবিতায় আপনার পূর্ব কবিদিগের যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"[১৩]

এইভাবে শাস্ত্রিমহাশয় কালিদাসের রচনাবলীর যে আনুমানিক ক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা যে সকল পণ্ডিতই মানিয়া লইয়াছেন, তেমন নহে। তবে, শাস্ত্রিমহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মত মিলুক বা নাই মিলুক, উহা যে শুদ্ধ একটা অভিনব মতবাদ বিদ্বৎসমাজে প্রচার করিবার মনোভাব হইতে প্রসূত নহে, উহা যে আজীবন কালিদাস-কাব্যরসিক মার্মিক সহৃদয়ের পক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকবির অজ্ঞাত জীবনের গাঢ় তমিস্রা কিয়ৎপরিমাণে দূর

করিবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস মাত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কালিদাসের কাব্যের উপরি-উক্ত ক্রম অনুযায়ীই আমরা এক্ষণে শাস্ত্রিমহাশয়কৃত কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যের সমালোচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। মহাকবির যে সাতখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও রঘুবংশই শাস্ত্রিমহাশয়কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে—তাই, এই চারিটি রচনাই তাঁহার সমালোচনায় প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। ঋতুসংহার, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীয়—এই তিনখানি কাব্যের উপর শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রবন্ধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্পই। কালিদাসের প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাঁহার রচনার অপরূপ মাধুর্য ও ইঙ্গিতধর্মিতা, চরিত্রচিত্রণে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ও সর্বোপরি তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বুঝিবার পক্ষে পূর্বোক্ত চারিখানি গ্রন্থ যেরূপ সহায়ক, শেষোক্ত গ্রন্থত্রয় যে তদনুরূপ নহে, সে বিষয়ে কোনও রসিকজনেরই বিবাদ থাকিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রিমহাশয়ও যে প্রধানতঃ পূর্বোক্ত কাব্যচতুষ্টয়কে কেন্দ্র করিয়াই কালিদাসের কাব্যসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সঙ্গতই হইয়াছে।

৬

আমরা হরপ্রসাদের 'মেঘদূত' সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনার বিষয় স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং বর্তমানে সে বিষয়ে আলোচনা পুনরুক্তিভয়ে পরিত্যক্ত হইল। 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য বিষয়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের সমীক্ষা কয়েকটি দিক দিয়া সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার 'রঘু আগে কি কুমার আগে?' শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় বিস্তৃতভাবে এই দুইখানি মহাকাব্যের রচনার পৌর্বাপর্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। 'কুমারসম্ভব'ই যে 'রঘুবংশ' অপেক্ষা পূর্বতন রচনা—শাস্ত্রিমহাশয়ের এই সিদ্ধান্তের সহিত ইতঃপূর্বেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে সেই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তি একত্র সংগৃহীত করা হইয়াছে। 'কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ?' শীর্ষক অপর এক প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় বর্তমানে প্রচলিত সপ্তদশসর্গাত্মক সমগ্র কুমারসম্ভব কাব্যখানি প্রকৃতই কালিদাসের রচনা কিনা তদ্বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই সমস্যাটি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ প্রচলিত আছে। শাস্ত্রিমহাশয় কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের রচনা, পরবর্তী অবশিষ্ট দশ সর্গ অন্য কবি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত এই মত সমর্থন করেন।[১৪] কিন্তু বর্তমানে ইহা

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গটিও কালিদাসের লেখনী হইতে প্রসূত। শাস্ত্রিমহাশয় যেসময় এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তৎকালে আচার্য আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' নিবন্ধের পঠন-পাঠন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে বর্তমানের ন্যায় প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থে 'কুমারসম্ভবে'র অষ্টম সর্গে দিব্য নায়ক-নায়িকা জগতের জনক-জননীস্বরূপ পার্বতী-পরমেশ্বরের যে লৌকিক নায়ক-নায়িকাসুলভ সম্ভোগের চিত্র মহাকবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রতি আনন্দবর্ধনের স্পষ্ট কটাক্ষ শাস্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল।[১৫] অতএব অষ্টম সর্গ পর্যন্ত যে কালিদাসের রচনা সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অবশিষ্ট নয় সর্গ সম্বন্ধে এখনও কোনও ঐকমত্যে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই।[১৬]

শাস্ত্রিমহাশয় 'পার্বতীর প্রণয়' শীর্ষক প্রবন্ধে কুমারসম্ভবে পার্বতীর কঠোর তপস্যার তাৎপর্য যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা প্রতিটি ছত্রে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্কে কালিদাসের ধারণা যে কত উচ্চস্তরের ছিল, তাহা বুঝানই এই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য। কালিদাসের কাব্যে যৌনরতির বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু মহাদেবের প্রতি পার্বতীর প্রণয় কামগন্ধশূন্য। তাই শাস্ত্রিমহাশয় প্রবন্ধের উপক্রমেই বলিতেছেন—

"আমরা আজ কালিদাসের একটি প্রণয়ের অদ্ভুত চিত্র দেখাইব। আমাদের কবিরা যে প্রণয়ের বর্ণনায় কত উচ্চে উঠিতে পারিতেন তাহা দেখান এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ... আমরা আজি যে কথা বলিতেছি তাহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের প্রণয়, বোধ হয়, ঋষিরাও কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি না? অন্য কবিদের তো কথাই নাই।

"সে প্রণয় পার্বতীর প্রণয়, শিবের প্রতি প্রণয়। যে প্রণয় দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেই প্রণয়। ..."

'কুমারসম্ভবে'র পঞ্চম সর্গে যখন হিমবৎপ্রস্থে দুঃসহ তপশ্চর্যায় নিরতা পার্বতীকে পরীক্ষা করিবার ছলে জটিল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ং মহাদেব পার্বতীর এই তপশ্চর্যা সত্যই মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই কি না জানিতে চাহিলেন, তখন পার্বতী যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন—

"যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর ত্বয়া
জনোঽয়মুচ্চৈঃপদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং

মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে ॥"

—তাহার উপর শাস্ত্রিমহাশয়ের মন্তব্য কত গম্ভীর!—

"পার্বতীর মুখে এই যে অনুরাগের কথা শুনিলাম, এরূপ আর কোথাও কেহ শুনিয়াছ কি? ইহাতে চাঞ্চল্য নাই, ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ নাই। ইহকালের কথাও নাই। ইহা স্থির ধীর অটল ও অচল প্রণয়। আমি কিছুই নই, আমার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু আমার আর উপায় নাই তাই আমি কঠোর তপস্যা করিতেছি। এই কথায় কত দৈন্য, কত আত্মবিসর্জন, মহাদেবের প্রতি কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা ও কত প্রেম প্রকাশ পাইতেছে।"

জটিলের মুখোচ্চারিত শত নিন্দাবাক্যেও পার্বতীর সংকল্প শিথিল হইল না; তিনি শুধু বিরক্তিভরে সখীকে নির্দেশ দিলেন—

"নিবার্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥"

পার্বতীর তপস্যা সফল হইল। মহাদেব আপন বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া পার্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন—

'অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিঃ—'।

"এই যে প্রণয়, ইহাতে কামগন্ধের লেশও নাই। তাই শুরুতেই কামদেব ভস্ম হইয়া গেলেন। কাম বলিতে 'স্পর্শ বিশেষ' বুঝায়; কিন্তু এখানে কাম শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় মাত্রেই। আমি আমার বাঞ্ছিতকে দেখিতেও চাই না, স্পর্শ করিতেও চাই না, তাঁহার স্বর শুনিতেও চাই না, তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণও করিতে চাই না। চাই শুধু আপনার সব—মনপ্রাণ সব—সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে; তিনি আমায় পায়ে রাখেন, এইটি জানিলেই আমি কৃতার্থ। এই যে অপূর্ব প্রণয়, এ একটা বড় তপস্যা। এই নিঃস্বার্থ প্রণয় লাভ করাও অনেক তপস্যার ফল। তাই পার্বতী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধও হইয়াছিল। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন, পার্বতী কাঁচা সোনা। তাই আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নিজে উপযাচক হইয়া, ঘটক খুঁজিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মদনকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দু'জনে মিলিয়া

এক হইয়া গিয়াছিলেন। পার্বতী শিবের অর্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছিলেন। আর কাহারও ভাগ্যে তাহা হয় নাই। কোনও দেবতারও নয়।" [১৭]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রও 'কুমারসম্ভব' কাব্যের উন্নত আদর্শ ও কবিত্ব-সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত [১৮] 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'কুমারসম্ভবে'র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

"কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। …সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং *Paradise Lost* নামক কাব্যের কথা বলিতেছি।…

"কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিদি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্বত, পর্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেবদেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সর্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়-পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক ও পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, তখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে; পরস্পর পরস্পরের সহায়।

"এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচরিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্‌টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, *Paradise Lost* হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চে। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষায় কোন মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। *Paradise Lost* পাঠে শ্রম বোধ হয; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায়। 'পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবম্' ইত্যাদি কবিতার্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত 'Like the bud bit by an envious worm' [১৯] ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণী [২০], কিন্তু কুলবতী সাধ্বীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুমসুকুমার।"

এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের উল্লেখ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু 'কুমারসম্ভব'কে শাস্ত্রিমহাশয় কবির পরিণত কবিত্বশক্তির নিদর্শনরূপে কখনই মনে করিতেন না—ইহার উচ্চ আদর্শ সত্ত্বেও। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় শাস্ত্রিমহাশয় 'রঘুবংশ' সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে মনে হয় বঙ্কিমের উচ্ছ্বসিত কুমারসম্ভব-প্রশস্তির প্রতি কিছুটা কটাক্ষ করিয়াই তিনি মন্তব্য করেন—

"…অলৌকিক বর্ণনার প্রয়াসও অল্পবয়সের প্রয়াস। কুমারসম্ভবময় অলৌকিক বর্ণনা, মহাদেব কল্পনাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ, পার্বতী স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণী; তাহার পর ইন্দ্র অলৌকিক, মদন অলৌকিক, রতি অলৌকিক, সবই অলৌকিক। যখন বহুদর্শিতা অল্প, অথচ কল্পনা মহীয়সী, অলৌকিক বর্ণনাটা সেই সময়েরই বর্ণনা।… উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদানের চেষ্টা বাল্যবয়সের কবিদের এক রোগ। সেটা প্রথম পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অলৌকিক প্রণয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভবের সৃষ্টি হইয়াছিল। পার্বতী সমস্ত ত্যাগ করিয়া পিতা-মাতা ভ্রাতা বন্ধু সমস্ত আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া নিজের জীবন তৃণতুল্য তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ

প্রণয়ের প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর পদার্থ অনুশীলনে রত। তিনি প্রথমে পার্বতীকে লক্ষ্যের মধ্যেই গণ্য করিলেন না, তাহার প· তাঁহার প্রথম প্রণয়োদয় সময়েই প্রণয়ে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু পার্থিব যাহা কিছু জঘন্য তৎসমুদয়ের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ মদন ভস্ম হইয়া গেল—কালিদাস দেখাইলেন যে-প্রণয়ে মদন ভস্ম হয় সেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা, তাহ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমহাদেব এই সারমঃ বুঝিয়া তত্ত্বচিন্তা ত্যাগ করতঃ পার্বতীর সেই অতুল প্রেমে মগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় লোকের এত দৌড় থাকে না··· ।"

প্রিয় শিষ্য হরপ্রসাদের এই পরোক্ষ বিরোধিতা[১] যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশ খানিকট ক্ষুব্ধ করিয়াছিল, তাহা শাস্ত্রিমহাশয় আর একটি প্রবন্ধে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাসঙ্গিকবোধে সে অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে দুইবার লিখিবার পর একদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন, 'বঙ্গদর্শনে রঘুবংশের কথ তোমার লেখা ?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ।' তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি এইরূপ বারবার লিখিবে ?' আমি বলিলাম, 'ইচ্ছা ত আছে।' তিনি তখন বলিলেন, 'তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীণ হইতে হইবে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন ?' তিনি তখন গরম হইয় বলিলেন, 'আমি বহুদিন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি যে আমার সব চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে আমি তাহা সইতে পারিব না। তুমি কি না বল, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জান কি ?' দেখিলাম, তিনি বেশ একটু রাগত হইয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, 'আপনি যদি রাগ করেন, আমি না হয় লিখিব না।' কিন্তু তাহাতে তাঁহার রাগ পড়িল না। তিনি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ঐ কথাই তুলিতে লাগিলেন। আমি যথাসময়ে চলিয়া আসিলাম।···"[২১]

কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত হইতে তিল মাত্র বিচ্যুত হন নাই —বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতার ভয়েও নহে, ইহা আমরা 'রঘুবংশ' সম্পর্কে আলোচনার সময় দেখিতে পাইব।

৭

বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং রসজ্ঞসমাজ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকটিকেই কালিদাসের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণও যে প্রধানতঃ এই মতই পোষণ করিতেন, তাহা 'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এই অতিপ্রচলিত আভাণক হইতেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রিমহাশয় যদিও 'শকুন্তলা'র শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোনও উক্তি করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না, তথাপি তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের এই অপূর্ব রূপকখানির বিচিত্র সৌন্দর্যে, ইহার চরিত্রচিত্রণে অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও নিখুঁত শিল্পকর্মসম্বন্ধে যে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন, তাহা তাঁহার 'শকুন্তলা' সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদন করিতে পারা যায়।

'শকুন্তলা' নাটকখানি মহাভারতীয় 'শকুন্তলোপাখ্যান' অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও, উভয় আখ্যানভাগের মধ্যে যে একাধিক বৈষম্য আছে, তাহা প্রত্যেক পাঠকেরই সুবিদিত। মহাভারতীয় আখ্যানভাগের সহিত নাটকীয়কথার প্রধান প্রভেদ দুর্বাসার শাপের অবতারণায়। কালিদাস যে শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার অধিকারী, তিনি যে স্বতন্ত্র সৃষ্টির শক্তি লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা দুর্বাসার শাপের অবতারণার দ্বারা যেমনভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, এমন আর কিছুর দ্বারাই নয়। দুর্বাসার শাপের ফলেই মহাভারতের সহজ সরল উপাখ্যান গাম্ভীর্য ও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদগ্ধমণ্ডলী দুর্বাসার শাপের নাটকীয় উপযোগিতা নানা দিক দিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে মহাকবির মূল অভিপ্রায়টি ক্রমশই পাঠকগণের নিকট স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর আকার ধারণ করিতে পারিয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয়ও যে দুর্বাসার শাপের অভিনবত্ব ও নাটকীয় পরিণতির পক্ষে ইহার অপরিহার্য মূল্য সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'দুর্বাসার শাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে জাজ্বল্যমান। প্রবন্ধটির প্রথম ছত্রেই তিনি বলিয়াছেন—'অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল।' কালিদাস এই একটিমাত্র ঘটনার অবতারণা করিয়া দুষ্যন্ত-চরিত্রকে রাজোচিত উদাত্ততা ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, সর্ববিধ কলঙ্ক হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছেন—

"মহাভারতে রাজা দুষ্যন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সে কথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু

প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে।...শেষ শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল যে, 'তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ।' ...তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোকলজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।"

অপরপক্ষে—

"কালিদাস দুর্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন কি দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। যখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি শকুন্তলাকে লইতে স্বীকার কেমন করিয়া করেন?... শকুন্তলা যখন কপট, শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন, 'তুমি ঘাসে ঢাকা কুয়া, ধর্মের কাচ করিয়া বসিয়া আছ' ['ধম্ম-কঞ্চুঅপ্পপ্পবেসিণো'], তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, 'দুষ্মন্তের চরিত্র ত' আমরা সবাই জানি, তবুও তাঁহার ভিতরে যে শঠতা আছে, কখন দেখি নাই।' যাঁহারা থিয়েটার দেখিতেছেন, তাঁহারা শাপের কথা জানেন। তাঁহারাও রাজার কোন দোষই দেখিতে পাইতেছেন না, বরং তাঁহার ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে দুষ্মন্তকে 'কাপুরুষতার' দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে।"

শুধু যে দুষ্মন্তের চরিত্রই দুর্বাসার শাপের প্রভাবে সর্ববিধ গ্লানি ও কাপুরুষতা হইতে বিমুক্ত হইযাছে, তাহাই নহে; শকুন্তলার চরিত্রের উপরও এই নিদারুণ শাপের প্রভাব নিতান্ত স্বল্প নহে। কণ্বতপোবনে সখীসমভিব্যাহৃতা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের রাজসভায় প্রত্যাখ্যানবিমূঢ়া অথচ দৃপ্তস্বভাবা তেজস্বিনী শকুন্তলার এবং পরিশেষে মারীচাশ্রমে বিরহব্রতধারিণী নিয়মক্ষামমুখী ক্ষমামূর্তি জননীরূপিণী শকুন্তলার তুলনা করিলেই শকুন্তলা-চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারাটি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবে। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টির সাহায্যে সাধারণ পাঠকের নিকট শকুন্তলা-চরিত্রের এই ক্রমপরিণতিটি অতি সহজভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন—

"শকুন্তলাও দুর্বাসার শাপে যথেষ্ট বদলাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই তিনটি সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম দুটি সখী ছিলেন, তার পর দুটি ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে স্টেজেই আনিতে পারেন নাই। শকুন্তলা পাপ কাহাকে বলে জানেন না। আদরের মেয়ে আদরেই আছেন, সংসারের কঠোরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড় নিদারুণ,

সংসারে যে পান থেকে চুণ খসিবার যো নাই, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন। একটি আঙটি—তাও আবার যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, তাহা জানিতেন না। সেই আঙটি না দেখাইতে পারিলে, যাঁহাকে সর্বস্ব দিয়াছেন এবং যিনি সর্বস্ব দিবেন বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন—তিনিও যে এই সামান্য জিনিসটা না থাকায় চিনিতে পারিবেন না, গরীব শকুন্তলার এতটা জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সে আঙটিটাকে যত্ন করিয়া রাখিল না। বড়ই কষ্ট পাইল। শেষে রাজা যখন আবার সেই আঙটি তাহার আঙুলে পরাইতে গেলেন, সে বলিল, 'আর না, ও আঙটিটাকে আমি বিশ্বাসই করি না।' দোষটা আঙটির হইল। দুঃখের দায়ে পড়িয়া শকুন্তলা এখন একটু শক্ত হইয়াছেন, এখন আর সেই আদরের মেয়ে নাই। সে একাই রাজার সঙ্গে দেখা করিল। রাজা ক্ষমা চাহিলে যথোচিত উত্তর দিল। কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনও হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন। রাজা চোখের জল মুছাইতে আসিলে, কত কি বলিয়া বাধা দিলেন না, আর সে আঙটিটাকে বিশ্বাস করিলেন না। এইরূপে শাপে দুজনেরই চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে।"[২২]

কিন্তু এই শাপ কি শুধুই কবিকল্পিত পাত্রপাত্রীর চরিত্রবিকাশের একটি অন্যতম উপায় মাত্র, না দুষ্মন্ত-শকুন্তলার আচরণের মধ্যেই, তাহাদের স্বভাবের মধ্যেই এই শাপের বীজ নিহিত ছিল, দুর্বাসার শাপ শুধু তাহারই প্রতীক মাত্র? শাস্ত্রিমহাশয়ও প্রশ্নটিকে এইভাবে আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। দুর্বাসার শাপের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাই তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে, যে কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সেকালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সেকালের কর্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ হইলে সেটা ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত। বল্লাল সেন মরিলেন—ব্রহ্মশাপে। কত রাজা উৎসন্ন গেলেন—ব্রহ্মশাপে। এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন ব্রহ্মশাপে। এতবড় বাহমনী মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল—ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়, কাব্যে পড়, আখ্যায়িকায় পড়, সর্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত ব্রহ্মশাপে। কালিদাস সেকালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে;

তাই অভিজ্ঞানশকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।"

অপিচ—

"রাজা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। শকুন্তলা অতিথিসেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। নইলে শুধু শকুন্তলার দোষে রাজার শাস্তি কেন হইবে?"

অবশ্য দুর্বাসার শাপ দুষ্মন্তের পক্ষে শুধুই মিথ্যাভাষণের শাস্তি বলিয়া ধরিলে, লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিতে হয়। দুষ্মন্ত-চরিত্রের আরও গূঢ়, গভীরতর ও গুরুতর দোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই দুর্বাসার শাপ কবিকর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্গত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে দুষ্মন্ত-চরিত্রের সেই অন্ধকার দিকটি সহৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কের সূচনায় হংসপদিকার গীত এবং বয়স্য বিদূষকের প্রতি দুষ্মন্তের সংক্ষিপ্ত অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ'—দুষ্মন্ত-চরিত্রের সেই অন্তর্নিহিত ত্রুটির প্রতিই যেন মহাকবির সংযত কটাক্ষ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন—

"পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।"

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের অপ্রধান চরিত্রগুলিকেও শাস্ত্রিমহাশয় কিরূপ নিপুণ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ 'শকুন্তলার মা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পঠনীয়। কালিদাস নাটকের কুত্রাপি মেনকাকে সশরীরে উপস্থাপন করেন নাই—সাধারণ পাঠকের কাছে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' মেনকা বলিয়া কোনও চরিত্র যে আছে, তাহা মনেই পড়িবে না, পড়িবার কথাও নয়। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় যেভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় মেনকা যেন অশরীরিণী ছায়ার ন্যায় আপনার মাতৃস্নেহবঞ্চিতা হতভাগিনী কন্যার পিছনে পিছনে রহিয়াছেন, বিপদের সময় তাহাকে রক্ষা করিতেছেন, আর সৌভাগ্যের দিনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কন্যার উদ্দেশে আপন অন্তরের আশীর্বাণী বর্ষণ করিতেছেন। সুতরাং যদিও জন্মক্ষণে মেনকা শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি কন্যার কল্যাণচিন্তা জননীর চিত্তে চিরজাগরূক ছিল। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার অপরূপ ভঙ্গীতে এই অশরীরিণী

মেনকাকে যেন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন,—মনে হয়, যেন শকুন্তলার ন্যায়ই মেনকা নাটকের একজন প্রধান পাত্রী—

"কিন্তু মেনকা কি শকুন্তলাকে ভুলিয়াছিলেন? তাহা ত বোধ হয় না। শকুন্তলার গল্প পড়িলেই মনে হয়, একটা না একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহার অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিতেছে; তাঁহার গতিবিধি দেখিতেছে ও যাহাতে তাঁহার ভাল হয় করিতেছে।...

"অভিজ্ঞানশকুন্তলে গোড়া হইতেই আমরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই। প্রথম অঙ্কে রাজা যেন নিয়তি-প্রেরিত হইয়াই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে সখীদের নিমন্ত্রণও যেন সেই নিয়তিরই খেলা। চতুর্থ অঙ্কে দৈববাণীও নিয়তির কাজ। বন-দেবতাদের হাত বাহির করিয়া গহনা দেওয়া অলৌকিক শক্তির বিকাশ মাত্র। পঞ্চমে ত স্ত্রীরূপধারী এক জ্যোতিঃ শকুন্তলাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ষষ্ঠে মেনকার এক সখী সর্বদাই উপস্থিত। সপ্তমে মেনকা স্বয়ং মারীচের আশ্রমে উপস্থিত আছেন। অতএব মেনকা মেয়েটিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বর্গ হইতে তাহার মঙ্গলের জন্য সর্বদাই উহার উপর চোখ রাখিতেন। অপ্সরা মহলের সকলেই জানেন, শকুন্তলা মেনকার মেয়ে। সকলেই শকুন্তলার মঙ্গলকামনা করিত।...

"আমরা কোথাও মেনকাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার কার্য সর্বত্র দেখিতে পাই। অনেক জিনিস তাঁহার কার্য নাও হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস মেনকাকে বাহির না করিয়া এমনি কৌশল করিয়াছেন—যাহা তাঁহার কার্য নহে, তাহাও তাঁহার বলিয়া বোধ হয়। মারীচাশ্রমেও মেনকাকে আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু দাক্ষায়ণী বলিয়াছেন, তিনি এখানেই আছেন। কেন আছেন? যেহেতু, আজ রাজার সহিত শকুন্তলার মিলনের দিন—আর মেনকা—শকুন্তলার মা।"

'কণ্বের কোমল মূর্তি' এবং 'কণ্বের কঠোর মূর্তি'—এই দুইটি প্রবন্ধেও শাস্ত্রি-মহাশয় লোকোত্তর কণ্বচরিত্রের বজ্রকঠোর অথচ কুসুমপেলব হৃদয়ের বিশ্লেষণে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। 'দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য' শীর্ষক আলোচনাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত 'নাটকে'র বিদূষকের ন্যায় অপ্রধান পার্শ্বচরিত্রের ভিতর দিয়াও কিরূপে বিচিত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর তাহা শাস্ত্রিমহাশয়ের 'দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য' এবং 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়'—এই দুইটি চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনার সহিত পরিচিত হইলে, স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর। মাধব্য-চরিত্রের সহিত গোতমচরিত্রের পরস্পর তুলনাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন—

"রাজা দুষ্যন্তের ভাঁড়টি একটু বোকা বোকা, একথাটি পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু অগ্নিমিত্রের ভাঁড়টি সেরূপ নহে, খুব চালাক, চটপটে; চালবাজ ও হুঁসিয়ার। একটা কথা পড়িলেই তাহা তলাইয়া দেখিতে পারে এবং আপনার কাজ কখন ছাড়ে না। আপনার কাজ অর্থাৎ রাজার কাজের জন্য সে সব করিতে পারে। একজনকে আজ রাণী করলে, কাল আবার তাঁকেই পায়ে ছান্‌লে। ভাঁড়রা সব সময়েই রসিকতা করিবার অর্থাৎ লোককে হাসাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু এ বিদূষকটির কথা অনেক সময় খরধার বিদ্রূপে পূর্ণ; লোকের মর্ম স্পর্শ করে। ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা ও সেই সঙ্গে বেশ দুকথা শুনাইয়া দেওয়া, তাহার বেশ আসে, কখন বাধে না।"[২৩]

অপিচ—

"গোতমের লেখাপড়া ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, সে ভদ্রবংশের ছেলে; তাহার সামাজিকতা বেশ ছিল, সে স্বভাবের শোভা বেশ বুঝিত। তাহার মতো সমজদার অতি অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু সে যে বেইমান। সে যাহার খায় তাহারও খাতির রাখে না। রাণী ও ইরাবতী তাহাকে কতই খাওয়াইয়াছেন পরাইয়াছেন, কিন্তু আপনার কাজের সময় সে কাহারও এক পয়সার খাতির রাখে নাই। কটকট করিয়া কটু কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ইরাবতী যখন সব অন্ধকার দেখিতেছে, তখনই সে যে এককালে দাসী ছিল, সে কথাটা মনে করাইয়া দেওয়াটা কি বেইমানের কাজ নয়? শুধু কি তাই, সে স্বপ্নেও মালবিকা দেখিতেছে, আর ইরাবতীর অমঙ্গল চিন্তা করিতেছে। রাণী ধারিণীর এত খাইয়াও তাহার দেবী শব্দটি কাড়িয়া লইয়া মালবিকাকে দেওয়া, এসব কি কম বেইমানী! কিন্তু একটা কথা ঠিক। সে রাজার খায় রাজার গায়। ধারিণী ইরাবতী, রাজা তাহাকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার খাতির করেন, নইলে করিতেন না। সে তাহা বেশ জানে। সে আলুরও চাকর নয়, বেগুণেরও চাকর নয়, সে রাজার চাকর, রাজার যাতে ভাল হয়, তাই করে। এতে কেহ তাহাকে বেইমান বল, নাচার।"

অনস্থয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত—'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র এই কয়টি পার্শ্বচরিত্রচিত্রণে কালিদাস অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রি-মহাশয়ই সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের নিকট উপস্থাপন করেন। মহাভারতে শকুন্তলা একা—নিজেই দুষ্যন্তের সহিত প্রণয়ালাপ করিতেছে, নিজেই রাজসভায় অবগুণ্ঠন-মোচন করিয়া দুষ্যন্তকে ভৎর্সনা করিতেছে। কিন্তু কালিদাসের সৌকুমার্যবোধ ইহাতে পীড়িত হইয়াছে—তাই মহাভারতের একক শকুন্তলা-চরিত্রকে খণ্ডিত

করিয়া তিনি ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ছয়টি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে শকুন্তলা চরিত্র ত' খণ্ডিত হয়ই নাই, বরং অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে।[২৪] দুষ্মন্তের সহিত প্রথম পরিচয় হইতে গান্ধর্ব বিবাহ পর্যন্ত অনসূয়া-প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহায়, রাজসভায় গৌতমী ব্রীড়িতা শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া রাজার সহিত তাঁহার পরিচয়সাধনের জন্য ব্যগ্র, আবার বিস্মরণ-দারুণ দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিবার জন্য শার্ঙ্গরব-শারদ্বতের রসনা ক্ষুরধার। এই-ভাবে মহাভারতের একা শকুন্তলা ছয়জন হইয়াছে—কালিদাসের চরিত্রচিত্রণের অপরূপ কৌশলের ইহা এক অনুপম নিদর্শন। শাস্ত্রিমহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—

"কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম, এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই তিনটি সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম দুটি সখী ছিলেন, তারপর দুটি ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে স্টেজে আনিতেই পারেন নাই।..."

৮

শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে 'রঘুবংশ' কালিদাসের কবিত্বশক্তির চরম পরিণতির নিদর্শন। তিনি রঘুবংশের নির্মাণকৌশল, চরিত্রচিত্রণ, ভাষাশিল্প, প্রভৃতি বিভিন্ন দিক্ লইয়া যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে এই কাব্যখানির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। ১২৯০ বঙ্গাব্দের (কার্তিক ও পৌষ) 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'রঘুবংশ' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় তিনি রঘুবংশ-সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য যত্নশীল হন। এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপোদ্‌ঘাত প্রসঙ্গে শাস্ত্রিমহাশয় যে-কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"অনেকে মনে করেন, রঘুবংশই কালিদাসের কাব্যসমূহের মধ্যে অপকৃষ্ট। কেহ বলেন উহা কাব্যই নহে। কেহ বলেন, উহা পুরাণ; কেহ বলেন, উহা ইতিহাস। একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, রঘুবংশ কালিদাসের কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি; প্রথম দিলীপ-সুদক্ষিণা, তাহার পর রঘুদিগ্বিজয়, তাহার পর অজেন্দুমতী, তাহার পর দশরথের মৃগয়া, তৎপরে রামায়ণ, তৎপরে কুশোপাখ্যান, তাহার পর অতিথির রাজনীতি ও সর্বশেষে অগ্নিবর্ণের দুশ্চরিত্র—এই কয়খানি কাব্য কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন, শেষে কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ জুড়িয়া একখানি কাব্য আকারে

প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ কোন মতেই মত দিতে পারি না। আমাদের মতে রঘুবংশ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, ইহা কাব্যসংগ্রহ নহে, একখানি কাব্য। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ইহার উদ্দেশ্য আছে, একতা আছে, উপদেশ আছে, এবং গভীর অর্থ আছে। রঘুবংশের দৈর্ঘ্যই উহার নিন্দার কারণ। এই সুদীর্ঘ কাব্য অনেকে পড়িয়া উঠিতে পারেন না। দুই চারি সর্গ পড়িয়াই শেষ করেন, ও একটা যা হয় সমালোচনা করিয়া বসেন। কালিদাসের রঘুবংশ যত অধিক দূর পড়িবে, ততই উহার সার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ সর্গ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার এরূপ দীর্ঘ কাব্য যত অধিক পড়িবে ততই উহার নির্মাণকৌশল অবগত হইতে পারিবে। ফলতঃ যখন প্রথম পড়িবে, তখন সব ছাডা ছাড়া লাগিবে। দ্বিতীয় বারে কতক বোধ হইবে উহার একতা আছে। তৃতীয় বারে একতা ও গূঢ়ার্থ স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। রঘুবংশ সমালোচনা সম্বন্ধে এইরূপ নানামুনির নানা মত আছে বলিয়াই কালিদাসের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা রঘুবংশের সমালোচনা অধিক প্রয়োজনীয়।”

‘রঘুকাব্য বড় কিসে?’ শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় রঘুবংশের অনন্যসাধারণ মহিমা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আজও স্মরণীয়—

“কাব্য বা মহাকাব্য হয় একটি নায়ক, একটি নায়িকা, একটি দেশ, একটি নগর বা একটি নগরী লইয়া। সমস্তটাই বহির্জগতেরই হউক বা অন্তর্জগতেরই হউক, একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। অন্তর্জগতের গণ্ডীও ছোট—হয় প্রেম, নয় করুণ, নয় বীররস। রঘুবংশ গণ্ডী মানে না। যদি ইহার কোন গণ্ডী থাকে, তবে উহা প্রকাণ্ড দিগ্‌দেশকাল ব্যাপিয়া। রসভাব বল, প্রায় সব ক’টিই উহাতে আছে। সুতরাং কি বাহিরে, কি ভিতরে, রঘুবংশ একখানি প্রকাণ্ড কাব্য। দেশ যদি বল, উহা সমস্ত ভারত জুড়িয়া আছে, এমন কি, ভারতের বাহিরেও পারস্যদেশ, আরবদেশ, যবনদেশ, হূণদেশ, লঙ্কা, উচাং, বোস্তাং, খোটান প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেরও একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া, মধ্যস্থলের দেশগুলিরও বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বর্গ আছে, মর্ত্য আছে, নাগলোক আছে, সমুদ্র আছে, পর্বত আছে, বন আছে, নদ-নদী আছে। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশে যাহা কিছু আছে, ইহাতে সবই আছে। দেশও যেমন প্রকাণ্ড, কালও তেমন প্রকাণ্ড।—২৯ পুরুষ এই কাব্যের বিষয়।…মোট কথা—সমস্ত পৃথিবীর কবিরা যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ভালগুলি

রঘুবংশে লইয়াছেন।"[২৫]

'রঘুবংশের গাঁথুনী' শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় নানাভাবে এই আপাতবিশ্লিষ্ট রাজপরম্পরার বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামায়ণের সহিত রঘুবংশের তুলনা করিয়া তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কবিত্বের দিক দিয়া, পরিণত-শিল্পবোধের দিক দিয়া কালিদাস যেন আদিকবি বাল্মীকিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন—

"হঠাৎ একদিন মনে হইল, রামায়ণ হইতে রঘুবংশ বড় কিসে? বাল্মীকিও বড় কবি, কালিদাসও একজন বড় কবি।...বাল্মীকির রামায়ণ রাম ও সীতার ছবিতেই উজ্জ্বল—যেন দুখানি দেব-প্রতিমা সামনে ধরিয়া দিয়াছে। কালিদাসের চেষ্টাটা যেন বাল্মীকির উপরেও টেক্কা দেওয়া। তিনি রাম ও সীতার ছবি আঁকিতে গিয়া দেখিলেন, জমিতেছে না, বাল্মীকির উপর জমিতেছে না। তখন তিনি রাম-সীতার আশে পাশে আরও অনেকগুলি ছবি দিয়া জিনিসটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তুলিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির ছবিখানি বজায় রাখিলেন। যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা খুব উজ্জ্বল, কালিদাস সেখানে খুব সংক্ষেপে সারিলেন। অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড তিনি একসর্গে ১০৪টি কবিতায় সারিয়া দিলেন [দ্বাদশ সর্গ]। কিন্তু যেখানে বাল্মীকির ফাঁক পাইলেন, সেইখানেই আপনার কবিত্ব-কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। এ ত গেল খাস রামায়ণে—যাহা লইয়া রঘুবংশের ১০-১৫ সর্গ। কিন্তু খাস রামায়ণের বাহিরে যে সব ছবি বাল্মীকিতে ত সেগুলি নাই; সেগুলি কালিদাসের নিজস্ব। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে বাল্মীকি যেন রাম ও সীতার দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া গিয়াছেন; আর কালিদাস তাহাতে Background দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছেন।"

কিন্তু ইহাতেও সব বলা হইল না—রঘুবংশের মূল ঐক্যসূত্র ইহাতে ধরা পড়িল না। তাই শাস্ত্রিমহাশয় শেষে বলিয়াছেন—"এক এক জায়গায় এক এক গুণের চরম, আর রামচন্দ্রে সকল গুণের চরম। এই রঘুবংশের সূত্র। এই রঘুবংশের 'Unity of action'। এই রঘুবংশের বীজ। ইহাই হিন্দুধর্মের—ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাণ।"—সেইজন্যই শাস্ত্রিমহাশয় রঘুবংশের গঠনপদ্ধতির সহিত পিরামিডের তুলনা দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভাংশটিতে শাস্ত্রিমহাশয়ের মননশীলতার সহিত সাহিত্য-বোধের সমন্বয় বিস্ময়কর—

"...তিনি দিলীপে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, দশরথে সত্যবাদিতার

পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,—এইসকল গুণরাশি ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিল ও রামচন্দ্রে একত্রে মিশিয়া প্রকাণ্ড পর্বতচূড়ায় পরিণত হইল। রাজাগুলি যেন পিরামিডের ধাপ, রামচন্দ্র যেন সেই পিরামিডের শিখর। পর্বতে দেখা যায়—একদিকে ধাপে ধাপে উঠে, অল্পে অল্পে উচ্চ হইতে থাকে, শিখরে উঠিয়া অপর দিকে একেবারে নামিয়া যায়। একদিকে অল্পে অল্পে চড়াই হয়, আর এদিকে উতরাই অত্যন্ত খাড়া খাড়া থাকে। রঘুবংশে তেমনি দিলীপ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথ, দশরথ হইতে রামচন্দ্র। তাহার পরেই একেবারে নামিয়া গেল। রামচন্দ্রের সদ্‌গুণগুলি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র লোপ পাইয়া আসিল। চড়াই হইল ১৫ সর্গে, উতরাই হইল ৪ সর্গে। যখন সব গুণগুলি লোপ পাইল, তখন অগ্নিবর্ণ স্ত্রীলোকের নেশায়, মদের নেশায় আত্মহারা হইয়া শেষে রাজযক্ষ্মায় প্রাণ হারাইলেন। এতবড় রঘুবংশে কি পরিণাম হইল? গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রীরা রাজ্য চালাইতে লাগিলেন।"

রঘুর বাল্যবর্ণনা ও সুদর্শনের বাল্যবর্ণনার তুলনা করিলেও সুবিশাল রঘুবংশের উত্থান ও পতন, চড়াই ও উতরাই-এর মর্মস্পর্শী দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার 'রঘুবংশের বাল্যলীলা' শীর্ষক প্রবন্ধে তাই বলিয়াছেন—

"কালিদাস রঘুবংশের প্রথমে আনন্দময় বাল্যলীলা ও শেষে বিষাদময় বাল্যলীলা দেখাইয়া বলিয়া দিতেছেন—তোমরা দেখ, উঠ্‌তিবেলা ও পড়্‌তিবেলা কত তফাৎ।"

লঙ্কাদ্বীপ হইতে আকাশমার্গে অযোধ্যা অভিমুখে ভ্রমণের যে বর্ণনা রঘুবংশে ত্রয়োদশ সর্গে লিপিবদ্ধ আছে, কাব্যসৌন্দর্যে তাহা অতুলনীয়। মহাকবি কি অপূর্ব কৌশলেই না রাম-সীতার অলৌকিক প্রেম চিত্রিত করিয়াছেন—দুঃখময় অরণ্যবাসের পূর্বস্মৃতিও আজ তাঁহাদের নিকট কত মধুর! শাস্ত্রিমহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—

"লঙ্কাদ্বীপ হইতে সারা ভারতবর্ষের—দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত সারা দেশের—এমন চমৎকার বর্ণনা আর নাই। যত বড় বড় জিনিস, সব দেখান হইল। পুরাণ কথা সব বলা হইল। পুরাণ প্রেমের কাহিনী সব মনে করিয়া দেওয়া হইল। রাম দেখাইলেন, সীতা দেখিলেন, মাঝে মাঝে সীতার উপর রামের প্রেম উথলিয়া পড়িল। এই মিলনই মিলন, চরম মিলন ও পরম মিলন।"

এইভাবে শাস্ত্রিমহাশয় বাঙালী শিক্ষিত সমাজের 'রঘুবংশ' সম্পর্কে বিকৃত ধারণা দূর করিয়া তাহাকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত লেখনী

চালনা করিয়াছেন—এমন কি, তিনি তাঁহার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিরোধিতা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই—ইহা আমরা 'কুমারসম্ভবে'র আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ, শাস্ত্রিমহাশয়ের রঘুবংশ সম্পর্কে এই সমুচ্চ ধারণা যে তাঁহার নিছক ব্যক্তিগত রুচি নহে, ইহা যে প্রাচীন সাহিত্যবিচারকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের অবিরোধী তাহা কালিদাসের 'রঘুকার' এই সুপ্রচলিত আখ্যার দ্বারাই নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার অভ্রান্ত সাহিত্য-বোধ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র।

৯

শাস্ত্রিমহাশয় যে শুধু কালিদাসের প্রত্যেকটি রচনার পৃথক পৃথক আলোচনাই করিয়াছেন, তাহাই নহে। মহাকবির সমগ্র রচনাবলীর সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগের অপূর্ব শিল্পকলা, ছন্দোনির্বাচনে তাঁহার নৈপুণ্য, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা—এই সকল বিষয় সম্পর্কে শাস্ত্রিমহাশয়ের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত প্রণিধানযোগ্য। কালিদাসের ভাষা সম্পর্কে (বিশেষতঃ 'রঘুবংশে') শাস্ত্রিমহাশয় বলিয়াছেন—

"তাহার পর ভাষা।...কালিদাসের অন্য সকল কাব্যে ও নাটকে ভাষার যে সকল দোষ দেখা যায়, রঘুবংশে সে সকল দোষ দেখা যায় না। ঋতুসংহার ও মালবিকাগ্নিমিত্রে অনেক সময় দূরান্বয় দেখা যায়। রঘুবংশে সে দোষ একেবারে নাই। কঠিন বা অপ্রচলিত শব্দ রঘুবংশে নাই বলিলেও হয়। যে ভাষায় কথাবার্তা চলে না, তাহার একটা দোষ—উহাতে লম্বা লম্বা সমাস আসিয়া জুটিয়া যায়। কালিদাসে কিন্তু সে দোষ বড় বেশী নাই। বাণভট্টে, ভবভূতিতে ও শঙ্করাচার্যে যেরূপ দেড়গজী ও দুগজী সমাস দেখা যায়, কালিদাসে সেরূপ একেবারেই নাই। সংস্কৃতভাষা শিখিতে হইলে, আমার বোধ হয়, কালিদাসই মডেল, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রঘুবংশই মডেল।"[২৮]

ছন্দঃপ্রয়োগে কালিদাসের অসামান্য নৈপুণ্য শাস্ত্রিমহাশয় যেমনভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, একজন আজীবন কালিদাস-কাব্যরসিক সহৃদয়ের পক্ষেই তাহা সম্ভব—সাধারণ সমালোচককুলের নিকট এই সহানুভূতিপূর্ণ উপলব্ধি প্রত্যাশা করা নিষ্ফল। নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টিতে শাস্ত্রিমহাশয়ের সজাগ শ্রুতিশক্তির নিদর্শন মিলিবে—

"এইবার ছন্দের কথা। যে ছন্দেই লেখা হউক, রঘুবংশের ছন্দগুলি অতি মধুর —যেন বীণা ঝঙ্কার করিতেছে। দ্রুতবিলম্বিত ও বিয়োগিনী যেন সেতার-তারে বা বেহালার সুরে গাঁথা। বিয়োগিনী শোকের ছন্দ, আর দ্রুতবিলম্বিত সুখের ছন্দ। এই দুই ছন্দ পড়িবার সময় যে শুধুই কানে সুরের মতো লাগে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে মনেরও তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও রথোদ্ধতার ত' কথাই নাই; উহা যে রসেই লাগাও, সেই রসেই লাগিবে; যে ভাবেই বল, সেই ভাবেই জোর করিয়া দিবে। ছন্দগুলি ১১ অক্ষরে লেখা—বৈদিক ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ভেদমাত্র। কালিদাস এইরূপ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার হাতে উহারা যেন ডাকিলে কথা কয়।"

'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'এক এক রাজার তিন তিন রাণী' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে শাস্ত্রিমহাশয় কালিদাসের নাট্যরচনার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি মহাকবির অবিচলিত নিষ্ঠা ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত ছিল; কিন্তু এই ধর্ম ও নীতিবোধ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছিল—

"প্রথম বয়সে বঙ্কিমবাবু যে সকল নভেল লিখিতেন, তাহাতে তিনি দেখিতেন, গল্পটি সাজান হইল কিরূপে। এক কথায় তিনি কাব্যাংশের দিকেই দেখিতেন, আর কিছু দেখিতেন না।...তাহার পর তাঁহার মাথায় ঢুকিল—কাব্যের সঙ্গে ধর্মের কথা বলিতে হইবে।...এক কথায় ধর্মপ্রচার করিতে হইবে।...

"কালিদাসেরও সেইরূপ। তাঁহার প্রথম বয়সের লেখায় ধর্মের কথা বড় একটা থাকিত না। মালবিকাগ্নিমিত্রে, মেঘদূতে, এমন কি বিক্রমোর্বশীতেও ধর্ম নাই, আছে কেবল কাব্য। আছে কেবল জমাট, আছে কেবল প্রেম। একটু একটু উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা একেবারেই টের পাওয়া যায় না। না তলাইলে টেরই পাওয়া যায় না। তাঁহার শেষ বয়সের লেখাও ত তাই। তবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহার উপদেশগুলিতে এখন হিন্দুধর্মের ভাব বেশী বেশী, কুমারসম্ভবের কথা ছাড়িয়া দাও, হর-পার্বতী লইয়া যে কাব্য, সে ত ধর্ম ছাড়া হইতেই পারে না। তাঁহার শকুন্তলায় ও তাঁহার রঘুবংশে বেশী হিন্দুয়ানী কথা আছে। সে সময় বৌদ্ধধর্মে ভারত ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন নাই। নিপুণ হইয়া পড়িয়াও তাঁহার কাব্যে বৌদ্ধভাব বা বৌদ্ধ-মত বা বৌদ্ধ-দ্বেষের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার হিন্দুয়ানীর তিনটি প্রধান অঙ্গ—একটি ব্রাহ্মণে ভক্তি, একটি

গরুতে ভক্তি, একটি দেবতার প্রতি ভক্তি; বিশেষ হরি ও হরের প্রতি ভক্তি। শকুন্তলায় শুদ্ধ ব্রাহ্মণে ভক্তিই প্রকাশ হইয়াছে, কুমারসম্ভবে হরের প্রতি ভক্তি, রঘুবংশে গো-ব্রাহ্মণ ও নারায়ণে ভক্তি। ভক্তির অভাব কোথাও নাই।··· রঘুবংশে বিষ্ণুভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি ও গো-ভক্তি তিনেরই বিকাশ; কিন্তু সে যে বিকাশ, সেও কাব্যেরই অঙ্গ। তোমার মনে হইবে, কাব্যই পড়িতেছি; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখিবে, ভক্তিটাই মূল। কাব্য কেবল বাহিরে। বঙ্কিমবাবুর এ চমৎকারিত্বটুকু নাই। তিনি নিজে দাঁড়াইয়া অনেক সময় ধর্মপ্রচার করেন। কাব্যে সেটা কেমন কেমন দেখায়।···"

ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ্য চতুরাশ্রম্যপ্রথা, মানবধর্ম-শাস্ত্রানুমোদিত রাজ্য-শাসনের সমুচ্চ আদর্শ, তপোবন-জীবন,—প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার যাহা কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কালিদাসের কাব্যে যেমনভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনটি আর কোনও পরবর্তী লেখকের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস যথার্থই 'আর্যকবি'।—

"Valmiki, Vyasa and Kalidasa are the essence of the history of ancient India; if all else were lost, they would still be its sole and sufficient cultural history."[৭১]

—শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হরপ্রসাদ অতি নিপুণভাবে মহাকবির সেই ভারতীয়তার প্রতি শিক্ষিত পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পাঠকসমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে সংস্কৃত সাহিত্য, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিদাসের রচনা, প্রধানতঃ শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় ভরপুর এবং অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। কালিদাসের বর্ণনায় স্ত্রীপুরুষের মিলনের বর্ণনা আছে, যৌবনের বিলাসলীলার বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু সত্যই কি তাঁহার কাব্যের তাৎপর্য তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই? শাস্ত্রিমহাশয় কালিদাসের রচনাবলীর বিরুদ্ধে এই প্রচলিত অপবাদ যে কতখানি ভিত্তিহীন ও অমূলক, তাহা তাঁহার 'পার্বতীর প্রণয়' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন।—

"···লোকে যে বলে কালিদাস বড় অশ্লীল সেই কথাটার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। সত্য সত্যই কি কালিদাস অশ্লীল? সত্য সত্যই কি তাঁহার কাব্য পড়িলে লোকের মনে কুভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়?

সত্য সত্যই কি তিনি স্থানে অস্থানে কেবল বথামীই করিয়া গিয়াছেন? আমার ত বোধ হয় তিনি তাহা করেন নাই। তিনি অতি বড় কবি। জগতের এমন সুন্দর পদার্থ কিছুই নাই যাহা তিনি বর্ণনা করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের মিলন জগতের একটা সুন্দর হইতেও সুন্দরতর জিনিস, সুতরাং সে জিনিসটাও তাঁহাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে, বিক্রমোর্বশীতে, শকুন্তলায় এই মিলনই মূলমন্ত্র; তাহার সঙ্গে অন্যও অনেক ভাল কথা আছে। কুমার ও রঘুতে সারা জগৎটাই আছে, তাহার মধ্যে এ মিলনও আছে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন কালিদাস ঐ কথা বই আর অন্য কথা কহেন না, তাঁহারা বড়ই বাড়াবাড়ি করেন বলিয়া মনে হয়। কালিদাস এক জায়গায় বাধ্য হইয়া কামকলার বর্ণনা করিয়াছেন। সে রঘুবংশের ঊনবিংশে—সর্গটির নাম 'অগ্নিবর্ণ—'। কিন্তু তাহার বর্ণনাও কত চাপা।... [অথচ] সেখানকার লেখা পড়িলে কালিদাস কত সাবধানে এই ভোগবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; অশ্লীলতায় তত নহে।

"এইরূপ স্থলে অন্য কবিরা কি করিয়াছেন, যদি দেখা যায়, কালিদাসকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অষ্টাদশ সর্গে নলদময়ন্তীর মিলনবর্ণনা করিযাছেন। সর্গের গোড়াতে তিনি বলিলেন, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রাদিতে যাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই, আমি এমন সব জিনিস বর্ণনা করিব। ঐ সর্গের ১৪৪ হইতে ১৫২ শ্লোক এত ভয়ানক যে স্ত্রীপুরুষেও বসিয়া পড়া যায় না। যাঁহারা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের ছোট ছোট নভেলগুলি পড়িয়া নাক সিটকান, আর নারায়ণের নিন্দা করেন, তাঁহারা যদি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া নৈষধের ঐ সর্গটি পড়িয়া দেখেন, বড ভাল হয়। এসব বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাস ত বাপের ঠাকুর। সত্য সত্যই ঋষি। তাঁহার বর্ণনা খুব চাপা—রঘুর ঊনবিংশ হইতেই একটি শ্লোক তুলিতেছি—

'চূর্ণবভ্রুলুলিতস্রগাকুলং...' [রঘু° ১৯।২৫] তিনি আরও দুই চারি জায়গায় বাধ্য হইয়া একটু একটু অশ্লীলতা আনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে অশ্লীল তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বুঝিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছাত্রদের জন্য যে সকল এডিশন্ করিয়াছেন তাহাতে উহা বাদ দেন নাই। যথা—

'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ—' [কুমার ৩। ৩৯] এসকল কবিতার তর্জমা করিয়া দিলেও কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে, উহার রুচিবিরুদ্ধ কোন জিনিস আছে। না বুঝাইয়া দিলে সেকথা বুঝিতে পারিবেন না।"

শিবের প্রতি পার্বতীর প্রণয় ত' দিব্যপ্রণয়; 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-নাটকের প্রথম ভাগের সহিত উত্তরভাগের তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় কালিদাস কিভাবে মর্ত্য দৈহিক কামলোলুপতাকে অপার্থিব দিব্যপ্রণয়ে রূপান্তরিত করিয়াছেন; 'মেঘদূতে'র ন্যায় মর্ত্যগন্ধী কাব্যেও কিভাবে দৈহিক সম্ভোগলালসার উপর আধ্যাত্মিক প্রণয়ের জয় হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রিমহাশয়ের নিজের ভাষাতেই শোনা যাউক—

"যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের জন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্য নর্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে দৌত্যের প্রধান কথা এই—'তুমি কেমন আছ?'

'তুমি কেমন আছ?' একথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটিতে অনেক পাঠক কোন নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ-সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সে-ই জানে 'তুমি ভাল আছ?' এই কথার মর্ম কত গভীর। যক্ষ কত বার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই; কত বার ভাবিয়াছে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম 'বৃন্তচ্যুত' হইয়াছে। তাই সে আজি 'তুমি কেমন আছ?' জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।" [২৮]

সুতরাং কালিদাস শুধুই সম্ভোগের কবি—ইহা নিছক অপবাদ মাত্র। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই যে, তিনি শৃঙ্গারের কবি—ব্যাপক অর্থে শৃঙ্গারের কবি। কেননা, শৃঙ্গারই যে সকল রসের উৎস—

> "শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
> স এব বীতরাগশ্চেৎ নীরসং সর্বমেব তৎ॥" [২৯]

১০

আমাদের এই আলোচনা আর দীর্ঘ করিতে চাহি না। বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গদ্যলেখক হিসাবে শাস্ত্রিমহাশয় সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা তাঁহার 'বেণের মেয়ে' এবং 'বাল্মীকির জয়'—এই দুইখানি উপন্যাস-রচনার ভিত্তিতেই সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয়ের গদ্যলেখক হিসাবে কৃতিত্ব বহুলপরিমাণে তাঁহার কালিদাস-কাব্য-সমালোচনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমীচীন। শাস্ত্রিমহাশয়ের গদ্যরীতির যে-সকল প্রধান বৈশিষ্ট্য—যেমন—প্রাঞ্জলতা, যুক্তিধর্মিতা, পরিহাস-রসিকতা—এগুলি কালিদাসের

সমালোচনামূলক প্রবন্ধরাজিতে যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনভাবে তাঁহার অন্যান্য রচনাবলীতে প্রকট হইয়া উঠিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। সর্বোপরি এইক্ষেত্রে ইহাদের সহিত সমন্বয় ঘটিয়াছে তাঁহার দীর্ঘগবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্যের ও সংস্কৃতসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পরিচারকের অকৃত্রিম অনুরাগের। ফলে, কালিদাস-কাব্য-সমালোচনা শাস্ত্রিমহাশয়ের লেখনীতে এক অপূর্ব সাহিত্য-সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে বাংলার বর্তমান পাঠকমণ্ডলীর নিকট এইসকল প্রবন্ধ অজ্ঞাতপ্রায়। অবশ্য, প্রবন্ধগুলির কয়েকটি ক্রটিও এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পত্রিকায় বিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে ভাবের ও সমালোচনার পৌর্বাপর্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয় নাই—একই বিষয়ের একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা ঘটায় পৌনরুক্ত্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া প্রবন্ধগুলিতে কথ্যরীতির প্রাবল্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধারাবাহিক সুসম্বদ্ধ আলোচনায় কথ্যরীতি অপেক্ষা সাহিত্যিক সাধু রীতিই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কথ্যরীতি শাস্ত্রিমহাশয়ের রচনারীতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহাকে বাদ দিলে শাস্ত্রিমহাশয়ের রচনার বৈশিষ্ট্যই খণ্ডিত হইত। এই কথ্যরীতিতে রচিত বলিয়াই প্রধানতঃ বর্তমানে আলোচ্য প্রবন্ধাবলীর পরবর্তী কালে যোগ্য সমাদর ঘটে নাই—ইহা বলিতে পারা যায়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শাস্ত্রিমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন—

"শাস্ত্রিমহাশয় মুখে যাই বলুন, কাজে তিনি চুটকিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুটকিতেই গলা সেধেছেন, চুটকিতেই হাত তৈরী করেছেন, সুতরাং কি কি লেখায়, কি বক্তৃতায় আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই।"

—এই উক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে সন্দেহ নাই। কালিদাস-সমালোচনাতেও তাঁহার এই স্বাভাবিক চুটকিপ্রিয়তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এইসকল বিক্ষিপ্ত রচনা একত্র সংগৃহীত হইলে বাঙালী পাঠকসমাজ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকবির কাব্যের অভিনব আস্বাদ লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া যেমন ধন্য হইবেন, সেইরূপ গদ্যলেখক হরপ্রসাদের এক অপরিচিত রূপের সহিত পরিচিত হইয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস।

১ বাঙ্গালা ১২৮৭ সালের ৩০শে চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১২৮৭) প্রকাশিত। দ্রষ্টব্য: হরপ্রসাদ-রচনাবলী (প্রথম সম্ভার), পৃ. ১৭১-১৯৬।

২ ঐ. পৃ. ১৮০। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন: "এই সময়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। ... বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ... তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোন সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্রমহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্তমান সাহিত্যপরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তিদ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।"—ঐ, পৃ. ২৩৮-২৪১ (১৩৪০)।

৩ "হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য ;—তিনি সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।"—রমেশচন্দ্র দত্ত: ঋগ্বেদের ভূমিকা (১৮৮৫)।

৪ নারায়ণ: বঙ্কিমস্মৃতিসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২।

৫ তুলনীয়: "পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতি হিসাবে হরপ্রসাদ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন: "তিনি জীবনে আমার Friend, Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।" (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩২৯)।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সা. সা. চ. ৭৩), পৃ. ২৩-২৪)।

৬ দ্র:—"The contributions to the *Bangadarsana* touched all the three principal subjects which along with the search for manuscripts and the preparation of their descriptive Catalogues, engaged 'Sastriji's attention for a longer period and in a larger measure in subsequent years than any other. These three subjects are the Bengali language and literature, Buddhism and its later developments and criticism of Kalidasa's poetical works."—*Mm. Dr. Haraprasad Sastri* (1853-1931): Dr. N. N. Law (*Indian Historical Quarterly*, Vol. IX, 1933, pp, 307-416)

৭ 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়': নারায়ণ, বঙ্কিমস্মৃতিসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২।

৮ দ্র: বাসুদেব বিষ্ণু মিরাশী: কালিদাস: (হিন্দী সংস্করণ). তৃতীয় অধ্যায় ('জন্মস্থানকী সমস্যা'), পৃ. ৫৯-৭১ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬)।

৯ তু° "Many evidences have been advanced by Sastriji in favour of his view that Kalidasa flourished in the latter half of the period between 404 and 533 A.C."—Dr. N. N. Law: *ibid.*, p. 330.

১০ তু° সূত্র°॥ অভিহিতোঽস্মি বিদ্বৎপরিষদা কালিদাসগ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রযোক্তব্যমিতি। তদারভ্যতাং সংগীতম্।

পারি°॥ মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ

কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।"

কালিদাসের রচনাবলীর খ্যাতনামা ইংরেজী অনুবাদক আর্থার রাইডার্ (A. W. Ryder)-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"There is irony in the fact that the works of the illustrious authors mentioned above have perished, that we should hardly know of their existence were it not for the tribute of their modest, youthful rival. But Kalidasa could not read the future."

১১ দ্র° *Chronology of Kalidasa's Works.*

১২ তুলনীয়ঃ "তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্তী হইয় কালিদাসও সর্বগুণবান্ রঘুগণের বার্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার হইয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

> "ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
> তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
> নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
> বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্॥"

এটি যৌবনের কান্না।

তারপর রতিবিলাপে,

> "গত এব ন তে নিবর্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
> অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥"

এটি বুড়া বয়সের কান্না।..."—কমলাকান্তের দপ্তর : 'বুড়া বয়সের কথা'।

১৩ দ্র° 'রঘুবংশ' (দ্বিতীয় প্রস্তাব), বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৯০।

১৪ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' এই বলিয়া মন্তব্য করেন—"প্রথম সপ্তম সর্গের সর্বত্র অনুশীলন আছে। অবশিষ্ট দশ সর্গ একেবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায়। এই দশ সর্গ কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হরগৌরীর সম্ভোগবর্ণনা তাহার কারণ।" —প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরতমল্লিক 'কুমারসম্ভবে'র সপ্তম সর্গ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তু°—"The common name of the rest of his commentaries seems to be '*Subodha*'; that on the *Kumarasambhava* extends up to the 7th Canto. According to Bharata this epic originally consisted of 16 Cantos, the last eight of which were lost by chance, while the 8th one was cursed by Parvati Herself. Thus,

> 'তস্য শেষাষ্টসর্গস্য সঞ্চারোঽভূন্ন দৈবতঃ।
> পাঠোঽষ্টমস্য সর্গস্য দেবীশাপান্ন বিদ্যতে॥'"

—Prof. Dinesh Ch. Bhattacharya : *Bharata Mallika and His Patron* (IHQ., Vol. XVIII. No. 2. 1942)

১৫ তু° "তথাহি—অধমপ্রকৃত্যৌচিত্যেন উত্তমপ্রকৃতেঃ শৃঙ্গারোপনিবন্ধনে কা ভবেন্নোপহাস্যতা। ত্রিবিধং প্রকৃত্যৌচিত্যং ভারতেবর্ষেঽপ্যস্তি শৃঙ্গারবিষয়ম্।...তস্মাদ্ অভিনেয়ার্থেঽনভিনেয়ার্থে বা কাব্যে যদুত্তমপ্রকৃতে রাজাদেরুত্তমপ্রকৃতিভির্নায়িকাভিঃ সহ গ্রাম্যসম্ভোগবর্ণনং তৎপিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণনমিব সুতরামসভ্যম্। তথৈবোত্তমদেবতাদিবিষয়ম্।"—ধ্বন্যালোকবৃত্তি : তৃতীয় উদ্দ্যোত, কারিকা ১০-১৪ (পৃ. ৩৩২, কাশীসংস্করণ)।

১৬ কুমারসম্ভব ৯ম সর্গের ১৪ শ্লোক—

"যুগান্তকালাগ্নিমিবাবিষহ্যং পরিচ্যুতং মন্মথরঙ্গভঙ্গাৎ।
রতান্তরেতঃ স হিরণ্যরেতস্যথোর্ধ্বরেতাস্তদমোঘমাধাৎ ॥"

—বর্ণিত অর্থের সহিত ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যা প্রাদেশিক ম্যুজিয়মে সংরক্ষিত একটি ভাস্কর্যশিল্পের ঘনিষ্ঠসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমানে কুমারসম্ভবের ৯ম হইতে ১৭শ সর্গ পর্যন্ত অংশও যে কালিদাস প্রণীত ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় রচিত 'The Authorship of the Latter Half of the *Kumarasambhava*' শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষভাবে আলোচ্য [J.A.S.B. (letters). Vol. XX. No. 2]. অধ্যাপক ভট্টাচার্য নবাবিষ্কৃত এই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন—"The two sculptures that have been described in the paper are 'proofs in stone' to use the language of the late M.M. H. P. Sastri ; and with their discovery the question has now become easier of solution—a hurdle is crossed and a great hurdle too. An intensive study of the whole text along with that of other works of the poet...will reveal that it was the same hand that wrote both the parts..." ঐ. পৃ. ৩১৫-৩৬। T. N. Ramachandran প্রণীত *The Identification of Two Interesting Sculptures from Orissa* শীর্ষক প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য (*Journal of Oriental Research, Madras.* Vol. XIX. Pt. I. pp. 1-13).

১৭ দ্র° "ধর্ম যখন তাপস তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল তখন স্বর্গ মর্ত্য এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়-রূপে অবতীর্ণ হইল ; এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্ষিবৃন্দকে স্পর্শ করিল, এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোনো গূঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না। ইহার যে অম্লান মঙ্গলশ্রী তাহা সমস্ত সংসারের আনন্দের সামগ্রী। সমস্ত বিশ্ব এই শুভ মিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।

"সপ্তম সর্গে এই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ-উৎসবই কুমারসম্ভবের উপসংহার।"—রবীন্দ্রনাথ : 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (প্রাচীন সাহিত্য, পৃ. ২৬)। অপিচ "সমস্ত কুমারসম্ভব-কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাঁধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে ; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। ... কুমারজন্ম ব্যাপারটা

কী তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে দেবরোষানলে আহুতি দিয়া অনাথা রতিকে বিলাপ করাইয়াছেন।
—ঐ. পৃ. ২৮

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০। দ্র° বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ. ৫০-৫২ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)।

১৯ দ্র° *Romeo and Juliet*, Act. I. Sc. i.

২০ শাস্ত্রিমহাশয় হিমালয়ের সহিত 'মেনা'র বিবাহ বর্ণনা করিতে গিয়া যে অপূর্ব মনীষা ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা দুর্লভ—

"এই যে এত বড় হিমালয়, ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে? এত বড় বরের এত বড় কনে নহিলে তো সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে? মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দ্যৌঃ আর পৃথিবী দুটিকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে এক জোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কখনও কখনও দ্বিবচনে 'মেনে' বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচন মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর, কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ 'আত্মানুরূপাং', অর্থাৎ হিমালয়ও যেমন, মেনকাও তেমনি। বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকার বিবাহ, এ যে কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।"

২১ দ্র° 'রঘুবংশের গাঁথুনি': নারায়ণ, শ্রাবণ ১৩২৫।

২২ তুলনীয়: "...শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেসদিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।" —বঙ্কিমচন্দ্র: 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২)। দ্র° বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ. ৮৮ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)।

২৩ দ্র° 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়'।

২৪ তু° 'আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদা ছিল না; একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা—চেনা কঠিন হইতে পারে।' —রবীন্দ্রনাথ: 'কাব্যের উপেক্ষিতা'।

২৫ তু° "রঘুবংশ লিখিবার সময় অন্যান্য কাব্য লেখা অপেক্ষা কিছু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যে অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবি কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশী লিখিতে কিছুমাত্র ভীত, কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয়েন নাই, রঘুবংশ আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে নানাবিধ দ্বিধার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিষয়ের মাহাত্ম্য, নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও প্রকাণ্ডত্ব ভাবিয়া চমকিত হইয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থ লিখিতে বসিলেই বাল্মীকি, বেদব্যাসের সহিত তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সে রঙ্গভূমে তাঁহার জয়লাভ একান্ত সন্দেহাস্পদ। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে, নায়ক নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা সহজ ও চিরপ্রচলিত। তিনি নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজে যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু এবার নূতন ব্যাপার। এ রচনায় নায়ক নায়িকা নাই, বিশ পঁচিশ পুরুষ ধরিয়া একটি বংশের বর্ণনা করিতে হইবে, অথচ সে বংশবর্ণনা পুরাণ হইবে না, ইতিহাসও হইবে না, অথচ উৎকৃষ্ট কাব্য হওয়া চাই। কালিদাস মনে মনে বিলক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন সামাজিকেরা তাঁহার গ্রন্থের আদর করিবে ত হইবেন, কারণ এ গ্রন্থখানি

সামাজিকতা, অলঙ্কারের নিয়ম, কবিদিগের চিরপ্রসিদ্ধি সমস্ত অতিক্রম করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন পুরঃসর লিখিতে হইয়াছে। তাই তিনি সামাজিকদিগকে তোষামোদ করিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিয়াছেন—

'তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥'

... এইরূপ সঙ্কুচিত হৃদয়ে, কুণ্ঠিত অন্তঃকরণে ও ভীত মনে, মহাকবি কালিদাস যে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে,

"... unattempted yet in prose or rhyme."

মিল্টন যদি *Paradise Lost* নামক মহাকাব্যের ভূমিকায় উহাকে "unattempted yet in prose or rhyme" বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, তবে আমাদিগেরও কালিদাসের উক্ত মহাগ্রন্থকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিবার অধিকার আছে।"—'রঘুবংশ' : দ্বিতীয় প্রস্তাব।

২৬ কালিদাসের ভাষার অপরূপ শিল্পসৌন্দর্য সম্পর্কে মনীষী শ্রীঅরবিন্দের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়—

"He is besides a consummate artist, profound in conception and suave in execution, a master of sound and language who has moulded for himself out of the infinite possibilities of the Sanskrit tongue a verse and diction which are absolutely the grandest, most puissant and most full-voiced of any human speech, a language of the Gods. The note struck by Kalidasa when he built Sanskrit into that palace of noble sound, is the note which meets us in almost all the best works of the classic literature. Its characteristic features of style are a compact but never abrupt brevity, a soft gravity and smooth majesty, a noble harmony of verse, a strong and lucid beauty of chiselled prose, above all, an epic precision of phrase, weighty, sparing and yet full of colour and sweetness. Moreover, it is admirably flexible, suiting itself to all forms from the epic to the lyric, but most triumphantly to the two greatest, the epic and the drama. In his epic style Kalidasa adds to these permanent features a more than Miltonic fullness and grandiose pitch of sound and expression, in his dramatic an extraordinary grace and suavity which makes it adaptable to conversation and the expression of dramatic shade and subtly blended emotion." —Sri Aurobindo : *Kalidasa* (First Series), pp. 16-17.

২৭ দ্র° Sri Aurobindo : *Kalidasa* (First Series), p. 1.

২৮ দ্র° বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৯ ('মেঘদূত')।

২৯ তু° —"... তবে রঘুবংশ ঠিক আদিরসের কাব্য নহে। উহা নব-রস-সংযুক্ত মহাকাব্য, তবে আদিরস উহার প্রধান রস। কিন্তু সে আদিরস খুব চাপা। যে আদিরসে জোয়ান বয়সে লোকে মাতোয়ারা হয়, সে ভাবের আদিরস নহে। অলঙ্কারশাস্ত্রে আদিরসকে মোটামুটি তিন ভাগ করে। পূর্বরাগ, সম্ভোগ, বিরহ। সম্ভোগ-শব্দটা একটু কেমন কেমন ঠেকে, তাই আমিও নামটা বদলাইয়া

মিলন বলিব। এই তিনই রঘুতে আছে, তবে চাপা, আর রঘুর যা আসল কথা—তাহাও ঠিক আছে। আর পাঁচ রাজার চেয়ে রামের এই তিনটিই গভীর ও চাপা বেশী। একখানি প্রকাণ্ড মহাকাব্য, যাহাতে সব কয়টা রসই পুরা বর্তমান, তাহাতে এই সবই বেশী বিস্তার হইতে পারে না, তাই সবই সংক্ষেপে আছে। সে সংক্ষেপও পাকা হাতের সংক্ষেপ। আসল কথাটি—সকলের চেয়ে ভাল কথাটি—দুকথায় বলিয়া দেওয়া আছে। বাকীটি তোমরা ভাবিয়া লও। সবিস্তার বর্ণনা না থাকিলেও এমন দুইটি আসল কথা বলা আছে, যাহাতে তোমার মনে অনেক কথা উঠিবে, আর তোমায় আনন্দে ভোরপুর করিয়া তুলিবে।"

—'রঘুবংশে প্রেম'

বসুধারা ॥ কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ ॥

শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের লক্ষণই এই যে, তাহা কখনও পুরাতন হয় না। যুগে যুগে সহৃদয় পাঠকের চিত্তে তাহা নব নব ভাব ও রসের উদ্রেক করিয়া থাকে। বিভিন্ন মনীষিগণ তাহার নূতন নূতন অর্থ ও অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। জগতের মূল-প্রকৃতির রূপ ও অভিব্যক্তির যেমন অন্ত নাই, তেমনই মহাকবিবাণীর দ্যোতনাও সীমাহীন ও অপরিচ্ছেদ্য। মহাকবি শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' 'কিং লীয়র' প্রভৃতি নাটকের কত শত ব্যাখ্যাই-না টীকাকারগণ প্রচার করিয়াছেন। তবুও মনে হয় যে, উহার মূল অভিপ্রায়টি যেন এখনও আমাদের বুদ্ধির পরিধিকে অতিক্রম করিয়াই রহিয়াছে। অনেক সময় সমালোচকগণের ব্যাখ্যা যে কবির মূল সৃষ্টি-প্রেরণার অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা নহে। বরং এমনও দেখা যায় যে, কবি সৃষ্টিক্ষণে যে বিষয় চিন্তাও করেন নাই, সমালোচক তাহাকেই কাব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শেক্সপীয়রের নাট্যকলার অন্যতম প্রধান সমালোচক ব্র্যাডলি কর্তৃক প্রচারিত 'কিং লীয়র্' নাটকের সমালোচনার প্রতি নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গোক্তিটি স্মরণীয়—

I dreamt last night that Shakespeare's ghost
Sat for a Civil Service post.
The English papers of the year
Contained a question on King Lear.
Which Shakespeare answered very badly
Because he hadn't studied Bradley.

কবিই যে অনেক সময় তাঁহার সৃষ্টিমুহূর্তের মূল প্রেরণাটি পরবর্তী ক্ষণে যথাযথ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, এমনও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শাজাহান' কবিতার কয়েকটি দুরূহ পংক্তির' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—

"কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে

হবে— সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশ জন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, যদি সন্তোষজনক না মনে কর, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।"[২]

সুতরাং শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম শুধু একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ হয় না। তাহার চতুষ্পার্শ্বে একটি অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল রচিত হইয়া থাকে, বিভিন্ন রসিকজনের বিচিত্র ব্যাখ্যা সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে ভিড় করিয়া থাকে— কবিসম্মত অর্থ সেই অনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম ব্যাখ্যা মাত্র। সব সময় সহৃদয় পাঠকের চিত্ত যে তাহাতেই সায় দিবে, এমন নাও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সমালোচক ব্র্যাডলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই সারবান্ তেমনই সহৃদয়ের অনুভববেদ্য—

"About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all. He said what he meant, but his meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it; something also which, we feel, would satisfy not only the imagination but the whole of us..."[৩]

অতএব, জগতের যেসকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি, সেগুলির মধ্যে সহৃদয় পাঠক কেবল কল্পনার নবীনতা, ব্যাপকতা অথবা ভাব ও ভাষার বিশিষ্ট বিন্যাস ও মাধুর্য—এইটুকু মাত্রই সন্ধান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; তাহারা উহাদের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব, কবিজীবনের কোনো অজ্ঞাত ঘটনা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য প্রভৃতির অন্বেষণও করিয়া থাকেন। হয়তো নিছক সাহিত্য-সমালোচনারূপে, অথবা রসদৃষ্টিসম্মত ব্যাখ্যারূপে তাহার কোনো গুরুত্ব নাও থাকিতে পারে; কিন্তু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের এই-জাতীয় বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা সমুদিতভাবে পাঠকের কাব্যরসাস্বাদকে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলে, যাহা কোনো একটি বিশেষ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া চলিলে সম্ভবপর হয় না।

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'ও এই জাতীয় একখানি কাব্য। নানা সুরসিক বিদ্বজ্জন ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে

এই কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছেন ; দার্শনিক ইহার মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছেন ; মরমী ইহার প্রতিটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে যেন নিজেরই একান্ত নিজস্ব অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ; আবার, যিনি নিছক কাব্যরসপিপাসু, তিনি শুধু এই খণ্ডকাব্যের অপরূপ ভাষাশিল্প ও বর্ণনার বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়াই বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্যের এই অতুলনীয় প্রকাশের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন। হয়তো শেষোক্ত সহৃদয়ের চিত্তাবস্থাই নিছক কাব্যসমালোচনার দিক হইতে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাও যে 'মেঘদূত' কাব্যের পরিপূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সে বিষয়েও কোনো মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 'মেঘদূতে'র বিভিন্নমুখী কয়েকটি ব্যাখ্যার আলোচনা করাই উদ্দেশ্য—সহৃদয় পাঠকগণ ইহাদের সারবত্তা নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিচার করিয়া দেখিবেন।

২

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধিকাংশ সমালোচকই একটি সাধারণ বিভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই বিভ্রমের জন্য যে তাঁহারা নিজেরাই দায়ী, তাহা বলিতে পারি না। এই বিভ্রমসৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের দায়িত্ব সমধিক। তিনিই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম টীকাকার যিনি কালিদাসের এই অখণ্ড শিল্পকর্মকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অর্বাচীন পাঠকসম্প্রদায়ের চিত্তমোহ সংঘটিত করিয়াছেন। 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ কালিদাসের কবিকল্পনার মধ্যে একেবারেই স্থান পায় নাই— ইহা যে অন্যান্য একাধিক টীকাকারগণের সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হয় তাহা নয়, মেঘদূতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক।[8] মেঘদূতের ত্রয়োদশ শ্লোকে যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

"হে মেঘ! তুমি প্রথমে আমার কাছে তোমার যাত্রার অনুকূল পথের বিবরণ শ্রবণ করো। পরে আমার শ্রোত্ররসায়ন বার্তা শুনিও।"

সুতরাং 'মেঘদূতে'র দুইটি প্রধান বিষয়বস্তু— একটি, অলকাগামী মার্গের বর্ণনা ; এবং অপরটি, বিরহিণী যক্ষপত্নীর উদ্দেশে যক্ষের বার্তা। খুব সম্ভব মল্লিনাথ এই

দুইটি বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়াই মেঘদূতকে দুই অর্ধে ভাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, মল্লিনাথ-পরিকল্পিত বিভাগ যে খুব যুক্তিসংগত হয় নাই, তাহা একটু প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 'উত্তরমেঘে'র ৪০শ শ্লোক পর্যন্ত অলকাপুরী, যক্ষের বাসভবন ও যক্ষপত্নীর বর্ণনা। অতঃপর কুশলপ্রশ্নের পর ৪১শ শ্লোক হইতে যক্ষের সন্দেশবাক্য আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং মল্লিনাথের 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ'-রূপে বিভাগকল্পনা এবং 'উত্তরমেঘে'র প্রারম্ভ নির্ণয় যে একেবারেই অযৌক্তিক, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে কালিদাস-রসিক অধিকাংশ বিদ্বজ্জনই কিন্তু 'মেঘদূতে'র এই বিভাগকে অভ্রান্ত ও কবিকল্পিত, অতএব মৌলিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'মেঘদূতে'র যে-সকল তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ভাবুকতা ও রসিকতার পরিচয় আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সকলের মূল ভিত্তি যে নিতান্তই শিথিল তাহা গোড়া হইতেই পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই অবতরণিকার প্রয়োজন।

৩

আবহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

১৩৪২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আলিপুর আবহতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন প্রধানাধ্যক্ষ ডক্টর এস্. এন্. সেন 'মেঘদূতে আবহতত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। "কালিদাস শুধু ভারতের মহাকবি নন, তিনি একজন প্রধান আবহতত্ত্ববিদ্‌ও ছিলেন"—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতঃ 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। বহু স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যান সত্যই চমকপ্রদ, এবং 'মেঘদূতে'র রসাস্বাদকে তাহা বহুল-পরিমাণে সমৃদ্ধ করে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি গোড়া হইতেই একটি কাল্পনিক অযৌক্তিক ভিত্তির উপর আপন সিদ্ধান্তটিকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তরমেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ একেবারেই কল্পনাপ্রসূত; কিন্তু ডক্টর সেন তাহাকেই সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং 'মেঘদূতে'র বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট অভিনব ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হইলেও ইহার বাস্তব ভিত্তি যে নিতান্তই শিথিল, তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। 'পূর্বমেঘ' নামকরণ সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—

"তিনি [কালিদাস] মেঘদূত কাব্য দুই অংশে ভাগ করিয়াছেন—প্রথম অংশের নাম পূর্বমেঘ; ইহাই বাদলের মেঘ যাহা আজও আর্যাবর্তের উপর দিয়া কোন্ পূর্বদিক হইতে বহিয়া থাকে। এই মেঘকে পথ দেখাইতে গিয়া কবির মন মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পাঁচ শত ক্রোশব্যাপী পথ অতিক্রম করিয়াছে। পথে পড়িয়াছে কত গিরি নদী জনপদ। অলকায় পৌঁছিয়া যাত্রাশেষে কবি উত্তরমেঘের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দেখা যায় যে আজও পশ্চিম হিমাচলের উপর এই মেঘ কোন্ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়। অলকা কি তাহা হইলে পূর্ব ও উত্তর মেঘের সন্ধিস্থল এবং এই জন্যই কি কালিদাস মেঘদূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন?"[৫]

হায়! যদি সত্যই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ কালিদাস-পরিকল্পিত হইত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা মল্লিনাথেরই প্রাপ্য। কিন্তু এই মৌলিক সর্বসাধারণ ভ্রমের কথা বাদ দিলেও ডক্টর সেন যেরূপ নিপুণতার সহিত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত বিস্তৃত মেঘের গতিপথের সহিত বর্তমানকালের বর্ষাকালীন মেঘের গতিপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। তিনি বলিয়াছেন—

"অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে অন্ততঃ ভারতের পণ্ডিত-মণ্ডলী জানিতেন যে বায়ুর গতির উপর মেঘের চলাচল নির্ভর করে। এসব তথ্য জানিয়া কালিদাস তাঁহার মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা পাঠাইতে প্রয়াসী হইলেন। এই প্রস্তাবকে আমরা কি মহাকবির শুধু একটা অলস কল্পনা কিংবা একটা খেয়াল বলিয়া ধরিয়া লইব, অথবা মনে করিব যে মহাকবি আর্যাবর্তে বহুপর্যটনের ফলে নানা মেঘগতি প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন?"

মোটামুটিভাবে, ইহার সহিত আমাদের মতের কোন বিরোধ নাই। সমগ্র ভারতভূখণ্ডের ভৌগোলিক ও তৎসজাতীয় সন্নিবেশ-বৈশিষ্ট্যের সহিত মহাকবির যে অন্তরঙ্গ ও অপরোক্ষ পরিচয় ছিল, ইহা তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে প্রত্যেকেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা এ কথা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মানিয়া লইতে পারি না যে, শুধু আবহতত্ত্ব বিষয়ক "অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই মহাকবি মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন।" কালিদাস-বর্ণিত মেঘপথের সহিত ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্রের তুলনাপ্রসঙ্গে ডক্টর সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক—

"এখন দেখা যাউক আগষ্ট মাসের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনের মেঘপথের সহিত কালিদাসের মেঘপথের কতটা সাদৃশ্য দেখানো যায়। এই উদ্দেশে ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্র দেখানো হইল। কালিদাসের মেঘপথও এই চিত্রে বসানো হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর দিয়া মেঘপ্রবাহের যেসকল রেখা টানা হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে কালিদাস-মেঘপথরেখার আশ্চর্য সাদৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ মেঘকে রামগিরি হইতে অলকায় যাইতে হইলে উজ্জয়িনী ঘুরিয়া যাইতে হয় না। এইজন্য মহাকবি 'পূর্বমেঘে'র অষ্টবিংশতি শ্লোকে মেঘকে রাজধানী দর্শনের নানারূপ লোভ দেখাইতে ছাড়েন নাই। বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উজ্জয়িনীর পথে পূর্বমেঘকে টানিয়া আনিতে হইলে কোনো বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয়। এই কারণ সাধারতঃ বাদলের ঝড়ের অভিযান। যখন এইরূপ কোনো ঝড় উৎকল হইতে গুর্জর অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন রামগিরি অঞ্চলে বর্ষা প্রবল হয় এবং পূর্বমেঘের রামগিরি হইতে উজ্জয়িনী হইয়া অলকা অভিমুখে যাওয়া খুবই সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কালিদাস পূর্বমেঘকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। এই তথ্য কি কাব্যরসের সম্যক্ উপলব্ধির সহায়তা করে না?"

ডক্টর সেনের সহিত আমরাও এক বাক্যে স্বীকার করি যে, এই নূতন তথ্যের জ্ঞান কালিদাসের কবিপ্রতিভার বাস্তবমুখীনতা উপলব্ধি করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, কিন্তু 'মেঘদূতে' মেঘের গতিপথ যদি নিতান্ত কাল্পনিকই হইত, তবে কাব্যরসসম্ভোগের দিক দিয়া কিছুমাত্র হানি হইত কি? 'মেঘদূত' এমনই এক কাব্য যাহার সম্পূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে বাস্তব সত্যাসত্যত্ববিচার নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার; উহা আপনার অন্তর্নিহিত কাব্যসত্যের উজ্জ্বল প্রভায় চিরভাস্বর। তবে ডক্টর সেন কর্তৃক উদ্ঘাটিত তথ্য বহিরঙ্গ বিচারের পক্ষে সত্যই উপযোগী ও মূল্যবান্, সে বিষয়ে সন্দেহই থাকিতে পারে না। তিনি 'মেঘদূতে'র 'পূর্বমেঘে'র ১৪শ শ্লোকের যে অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। শ্লোকটি সুপ্রসিদ্ধ—

> অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
> র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
> স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
> দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

ডক্টর সেনের মতে "মল্লিনাথ আবহতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না এবং এইজন্য এস্থলে

মহাকবির আবহসম্বন্ধে ইঙ্গিত ধরিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং তিনি হস্তীশুণ্ডের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমার মনে হয় হস্তীশুণ্ড দ্বারা মহাকবি জলস্তম্ভ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। জলস্তম্ভ যে আমাদের দেশে হাতীশুঁড় নামে পরিচিত ইহা আমরা সকলেই জানি। যাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে তাঁহারা জলস্তম্ভের ছবি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

"সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেঘের উত্তরাস্যে অলকার পথে গমনের সময় মাঝেমাঝে জলস্তম্ভের আবর্তে পড়া সম্ভব। এই জন্যই কি কালিদাস পূর্বমেঘকে সতর্ক করিয়াছিলেন ?"

দার্শনিক ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা'র "শীতে ও বসন্তে" শীর্ষক কবিতায় পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

মেঘদূত লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে আহা !
আমি দেখায়েছি তাহা
দর্শনের নবসূত্র।

কিন্তু কৌতুকবশে নহে, সত্যসত্যই গম্ভীরভাবে, 'মেঘদূতের দার্শনিক ব্যাখ্যা' উপস্থাপন করিবার মতো মনীষারও আমাদের দেশে অভাব হয় নাই। ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় উল্লিখিত শিরোনামায় ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের সূচনায় প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন—

"এই প্রবন্ধে আমরা মেঘদূত কাব্যের তাৎপর্য হইতে কালিদাসের বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিব।"

বেদান্তসম্মতভাবে 'মেঘদূতে'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব বা অনন্যত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই যেন কালিদাস বেদান্ত মতের অনুসরণ করিয়া এই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদনে যুক্ত হইয়াছেন এবং সেই রসস্বরূপ আনন্দময় পরমাত্মাতে যদি জীবাত্মা নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারেন, তবেই উভয়ের চিরন্তন অন্যোন্য তাদাত্ম্য উপলব্ধ হইতে পারে— এই গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বই কবি লৌকিক ব্যবহার স্বীকার করিয়া যক্ষ ও যক্ষিণীর বিরহব্যথা

ও উভয়ের মিলনবার্তার বর্ণনা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন—আমাদের নিকট এইরূপ ভাব প্রতিভাত হয়।”

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বসমূহের সহিত মেঘদূতে বর্ণিত বিষয়ের যেভাবে সমীকরণ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে পাওয়া যাইবে—

“আমার মনে হয়— কালিদাস যক্ষিণীরূপিণী পরমাত্মার সহিত যক্ষরূপী জীবাত্মার ঐকান্তিক চিরমিলনের সম্ভাবনা বর্ণনা করিতে যাইয়া, সঙ্গেসঙ্গে মেঘরূপী জ্ঞানের পথও নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মেঘ যেমন যক্ষ ও যক্ষপত্নীর মিলনবার্তা বহনে পরম সহায়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন-মিলন সংঘটনে জ্ঞানও তেমন পরম সহায়। বেদান্তশাস্ত্রোক্ত ‘উত্তরপথ’ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পথ। সেই পথ দিয়া মোক্ষবিদ্যাধিকারী জীবের জ্ঞানরূপ সহচর বন্ধু বিচরণ করে এবং সেই পথ দিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইয়া, সে অবশেষে হর্ষশোকের অতীত পরমাত্মার সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেয়।..ইহা স্মরণ রাখিয়া কালিদাস সম্ভবতঃ মেঘকে দূত করিয়া পার্থিব যক্ষ ও যক্ষিণীর বিয়োগ ও সংযোগের বার্তা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দময় ও রসময়, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যেন ব্রহ্মলোকসদৃশ অলকাপুরীর ও ব্রহ্মস্বরূপিণী অলকানিবাসিনী যক্ষবধূর বর্ননায় এতটা রসময়ী রচনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, কালিদাস বেদান্তশাস্ত্রে নিহিত আত্মবিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই ললিতকাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তরপথে প্রয়াণ দ্বারাই জীবের পক্ষে ব্রহ্মরসের আস্বাদ সম্ভাব্য হয়। তাই বুঝি, যক্ষকে জীবাত্মা, যক্ষপত্নীকে পরমাত্মা ও মেঘের উত্তরদিগ্‌গামী পথকে জ্ঞানের উত্তর-পথরূপে কল্পনা করিয়া কালিদাস নিজেই ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি এত বড় বৈদান্তিক!”

বলিতে হয়, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, কালিদাসের ‘মেঘদূত’ রচনার মূল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে—সংস্কৃত সাহিত্যরসিক পাঠককুল যে মেঘদূত হইতে বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করিতে উন্মুখ হয় না, এই নিতান্ত মোটা কথাটা সহৃদয় পাঠকের এতই অনুভবসিদ্ধ যে, তাহা আর স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তথাপি ব্যাখ্যাটি অভিনব— সুতরাং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

৫

মেঘদূতের রসিক-ব্যাখ্যা

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় কালিদাস-কাব্য-রসিক মনীষী বিরল। তিনি কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তত আর কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। কিন্তু তাঁহার রচনার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, কোথাও তাঁহার সমালোচনা পাণ্ডিত্যভারাক্রান্ত নয়। বরং সংস্কৃতসাহিত্যে ঐরূপ একজন দিগ্গজ পণ্ডিতের লেখনী হইতে ঐ প্রকার লঘু অথচ সরস রচনা কিরূপে বাহির হইল, তাহা আমাদের কাছে পরমবিস্ময়স্থল বলিয়া মনে হয়।

শাস্ত্রিমহাশয় একাধিক প্রবন্ধে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য ও কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন,* কিন্তু সবগুলিতেই এমনই একটি প্রসন্ন পরিহাসরসিকতা বিরাজিত আছে যে, অনেক সময় পাঠকের বুঝিবার অবসরই হয় না যে, সেই আপাতচটুলতার অন্তরালে কতখানি মননশীলতা ও বিশুদ্ধ সাহিত্যসৌন্দর্যবোধ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'মেঘদূত' নামক পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে শাস্ত্রিমহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কালিদাসের কাব্যব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রিমহাশয় কি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন—

"হিমালয়ের যেমন পাঁচটি চূড়া— গৌরীশঙ্কর কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরি মুক্তিনাথ ও গোসাইথান, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি রঘুবংশ উত্তরচরিত শকুন্তলা মেঘদূত ও কুমারসম্ভব অতি উচ্চ, অতি গম্ভীর, অতি শোভাময়, অতি পরিষ্কার ও অতি রমণীয়।

"পাঁচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝাইবার জন্য। ভাব বুঝানো কোনো কোনো ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইলেও সৌন্দর্য বুঝানো কোনো ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ কাব্যগুলি সৌন্দর্যের খনি, ছোটখাট খনি নয়, একেবারে জোহানেসবর্গ। এই সৌন্দর্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি, অনেকদিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম, সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেই জন্যই

সকলের ছোট যে মেঘদূত, তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য, উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একরূপ মীমাংসা করিয়া লইলাম। লেখা শেষ হইল। ছাপানোর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামত লিখিলাম।"[৭]

কিন্তু একটি বিষয়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের খটকা লাগিল, তাহা রুচির প্রশ্ন লইয়া। শাস্ত্রিমহাশয়ের নিজের কথাতেই ঐ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য উল্লেখ করি—

"কিন্তু এক কথায় বড় ঠেকিয়া গেলাম। সৌন্দর্যের মুখে রুচির উপর বড় একটা ঝোঁক থাকে না। রুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য বদলায় না। এখন যাহা কুরুচি, কালিদাসের সময়ে তাহা কুরুচি ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি, আমাকে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল। অনেক জিনিস এখনকার রুচিসংগত হইবে না, বেশ বোধ হইল…।"[৮]

এক্ষণে 'মেঘদূত' পুস্তিকা হইতে দুই-একটি স্থল উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—তাহা হইতে কি দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শাস্ত্রিমহাশয় 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলিবে। 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোকেই কালিদাস কুবের শাপে অস্তংগমিতমহিমা নির্বাসিত যক্ষের যে অবতারণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যা শোনা যাউক—

"কুবেরের সরকারে সে একটি চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিয়া বোধ হয় না; কেননা, কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সল্‌স্‌বরি, চেম্বারলেন হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ, কুবেরের দৃষ্টি তাহার উপর ছিল; এবং কুবের কিছু রাগিয়াই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটি বড় কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত, কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা-কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল: বয়স তো যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটিও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত, বুঝি পদ্ম-শঙ্খেরও উপর কোনো অমূল্য নিধি পাইয়াছি। একটু আসিতে দেরী হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয়তো কুবের টুকিয়াছিলেন; তারপর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতীকার আবশ্যক হইল। অপরাধ তো সাব্যস্তই আছে। কি শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোডে

হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান-একাদশীর পরদিন যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন এ ছোঁড়া যেরকম পাগ্‌লা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে তার দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া লঘু হইয়া, চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে বা তাহার সঙ্গে দেখাশুনা করিবে, কুবের সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড় লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেণেদের সঙ্গে জুটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। কাশী কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্মে কর্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচকি মিচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রামগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটি আশ্রমের কুটীর ভাঙিলে তিনি আর-এক আশ্রমে কুটীর নির্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন, সেইখানেই জল-ক্রীড়া করিতেন; সীতা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন— খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞান-যোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহ-বেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।”[৯]

‘পূর্বমেঘে’র ১৯শ শ্লোকে যেখানে বিন্ধ্যপাদপ্রবাহিণী রেবার বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন—

রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।

তাহার ব্যাখ্যায় শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন—

“শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।[১০] কি উৎকট অবস্থা! বিন্ধ্যের পা গুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ডেলায়, ডুমরিতে এব্‌ড় খেব্‌ড়। যেন কোনো গোদা মিন্‌সের পায়ে ধরিয়া নর্মদা আলুথালুভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্মদা, উপরে কূর্মপৃষ্ঠবৎ অবস্থিত বনরাজি-বিরাজিত বিন্ধ্যপর্বত। মাঝে মাঝে সাদা ঝরনা পর্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া

নর্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে, যেন একটা হাতীর শিঙার হইয়াছে। বড় বড় সাদা সাদা লাল লাল কালো কালো ডোরা-দেওয়া হাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই এ উপমার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"[১১]

দশার্ণের রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' নামে একটি পাহাড়—যক্ষ মেঘকে বিশ্রামের জন্য সেই পাহাড়ে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে—

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রান্তিহেতোঃ—

এই শ্লোকের শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিব কি ?—

"সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইয়ো। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে, তাহার পুলক কদম্ব ফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাডটি কূর্মপৃষ্ঠ, ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। উহা বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক-একটা খালি ঘর নির্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কি হয় ?— এমন কিছু নয়— একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা— এই কথা যে নগরবাসীদের যৌবন-দড়ি ছেঁড়ে— স্মৃতির লাগামে, ধর্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা ; নির্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে—সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য—(contradiction in terms)। দূর মূর্খ, দেখিতেছিস না—নাক কি নাই ? ও কিসের গন্ধ ? ও যে পরিমল— চটকান ফুলের গন্ধ ; ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে— বুঝিতেছিস না কে ঐ ফুল চটকাইল—কখন্ চটকাইল, কেমন করিয়া চটকাইল— যদি না বুঝিয়া থাকিস, যা— তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।"[১২]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে শাস্ত্রিমহাশয়ের 'মেঘদূত' ব্যাখ্যার শৈলীর কিছু নিদর্শন মিলিবে। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া তিনি শিক্ষিত সমাজের শালীনতাবোধকে বেশ কিছুটা উপেক্ষা করিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্বকই করিয়াছেন ; কেননা, মেঘদূতের কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব বুঝিতে হইলে ঐ প্রকার নগ্নবিশ্লেষণ ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবপর নয়। তবে কালিদাসের পক্ষে একটু সুবিধা ছিল এই যে, তিনি দেবভাষার মাধ্যমে শিল্পকর্মকে রূপ দিয়াছেন এবং দেবভাষার এমনই এক অলৌকিক শক্তি আছে, যাহাতে আপাত অশ্লীল ভাবরাজিও অপূর্ব সুষমা ও লালিত্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু শাস্ত্রি-

মহাশয়কে অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছে, সেই অপরূপ শিল্পকর্মকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য সাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে হইয়াছে বঙ্গভাষার মাধ্যমে। শাস্ত্রিমহাশয় যে বলিয়াছিলেন—

"সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলংকার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল ইতিহাস পুরাতত্ত্ব স্বভাব নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন। এত নূতন করিতে গিয়া যদি ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন। প্রথম পথিকের ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য।"[১৩]

তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সৌন্দর্যের এই নবীন ব্যাখ্যান-শৈলী প্রবর্তন করিতে গিয়া তিনি যে সভ্য বিদগ্ধ সমাজের প্রচলিত শালীনতাবোধের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হন নাই, সেজন্য তাৎকালিক বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল—শাস্ত্রিমহাশয়ের সাহিত্যজীবনে তাহা এক বেদনাকর অধ্যায়।[১৪]

শাস্ত্রিমহাশয়কৃত মেঘদূতের সৌন্দর্য-ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি বুদ্ধিকৃত বিশ্লেষণ। শাস্ত্রিমহাশয়ের রসানুভূতিক্ষমতা পূরামাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, বিশ্লেষণ-প্রতিভাই ছিল তাঁহার মনীষার প্রধান লক্ষণ। সেই অক্লান্ত গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাঁহাকে যতদূর লইয়া গিয়াছে, তিনি ততদূর গিয়াছেন। শ্লীলতা-অশ্লীলতার সংকীর্ণ গণ্ডী তাঁহার বিশ্লেষণী বুদ্ধির গতিপথকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। বুদ্ধির সহিত সাহিত্যিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটিলেও, শাস্ত্রিমহাশয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধিই ছিল নিয়ন্ত্রী শক্তি। তাই তাঁহার রচনা রসঘন হইলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর।

উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশগুলিতে মনীষার সহিত রসদৃষ্টির যে সমন্বয় হইয়াছে, শাস্ত্রি-মহাশয়ের কালিদাস কাব্যসমালোচনার অধিকাংশ স্থলেই তাহা পাঠকের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। কালিদাসের কবিকল্পনার মূল প্রেরণাকে বুঝিবার ও সর্বজনবোধ্যভাবে তাহাকে সাধারণ পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রয়াস দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজীবন কালিদাসের কাব্যের অনুশীলন করিয়াও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮২ খৃঃ 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় শাস্ত্রিমহাশয় 'মেঘদূতে'র যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, তাহাই তাঁহার নিজের কাছে অপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে; তাই দ্বিতীয়বার 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার উপক্রমে তিনি বলিয়াছেন—

"অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।[১৫] পড়িয়া দেখিলাম, মনোমত হইল না— ফিকে লাগিল। তখন পূর্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ-লেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন সেরূপ করিতে ভরসা হয় না। করিলে মনে হয়, কালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্বমেঘ মেঘদূতের অর্ধেক, তাই যদি ছাড়িয়াছিলাম তবে ব্যাখ্যা করিয়াছি কি ছাই? উত্তরমেঘেও অনেক স্থান ভাসা ভাসা ছিল, অনেক স্থানের সৌন্দর্যবোধই হয় নাই। তাই আবার একবার নূতন করিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।"[১৬]

'মেঘদূতে'র সৌন্দর্যে, 'মেঘদূতে'র রসসংবেদনে শাস্ত্রিমহাশয় যেন বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন! অলংকার-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে 'মেঘদূত' 'খণ্ডকাব্য' রূপে পরিচিত। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়াই এ প্রসঙ্গ সমাপন করিব—

"মেঘদূতকে অলংকার-শাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরেজরা লিরিক বলেন। কোনটি সত্য? খণ্ডকাব্য— অর্থ যতদূর বুঝা যায়— টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা নহে— পুরা, সর্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ, এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা নহে। ছোটকাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে তো ছোট বুঝায় না।.. তবে যদি কেহ বলে, খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,— তখনকার প্রধান মিষ্ট সামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয়-নিমাই-চরিত। তেমনি সেকালে খণ্ডকাব্য অর্থে মধুময় অমৃতময় কাব্য। টুকরা ফুকরা বলিলে জমে না।"[১৭]

৬

মেঘদূত ও রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরেই 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যাতারূপে যাঁহার নাম স্বতই মনে উদিত হয় তিনি রবীন্দ্রনাথ। শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যার সহিত রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার প্রকৃতিগত ভেদ আছে। এই ভেদের মূল নিহিত আছে তাঁহাদের উভয়ের মানসিক

সংগঠনের মধ্যেই। একজনের মনীষা বুদ্ধিপ্রধান, আর-একজনের মনীষা কল্পনাপ্রধান। একজন রসবিদ্ পণ্ডিত, আর-একজন মার্মিক কবি। ফলে ব্যাখ্যানভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার প্রখর ধীশক্তির সাহায্যে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন— তাঁহার রীতি analytic বা বিশ্লেষণ-প্রধান ; অতএব শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রদর্শিত মেঘদূতের সৌন্দর্য বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রীতি synthetic—তিনি তাঁহার অলৌকিক কল্পনাপ্রভাবে মেঘ-দূতের বাহ্যসৌন্দর্য উত্তীর্ণ হইয়া উহার গহন অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অলৌকিক অখণ্ড শিল্পকর্মের নিগূঢ় মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যায় আমরা যেন 'মেঘদূতে'র অপরূপ শিল্পশরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাই ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য অতীন্দ্রিয় অনুভববেদ্য, বিশ্লেষণী বুদ্ধি সেখানে পরাস্ত। এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি অপরটির পরিপূরক—উভয়ের সমন্বয়েই 'মেঘদূতে'র সামগ্রিক আস্বাদন সম্ভবপর। তথাপি রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যে গভীরতর ও অন্তরঙ্গতর তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—এবং সেই কারণেই সেই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সাজাত্য অনুভব করিবার মতো মানসিক পটভূমি যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের নিকট তাহা কতকাংশে mystic বা হেঁয়ালি বলিয়াও মনে হইতে পারে। 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দের গম্ভীরমন্থর ধ্বনি যেন কোনো দূরশ্রুত বেদনাবিধুর সংগীতের মূর্ছনার মতো কবিমানসে চিরপ্রসুপ্ত জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রতিবোধ সাধন করিয়াছে— রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা পাঠ করিলে বারংবার আমাদের ইহাই মনে হয়। 'মেঘদূত' কিভাবে কবিমানসকে উদ্বেলিত করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মেঘদূত' শীর্ষক কবিতায়। কালিদাসের 'মেঘদূতে'র ইহা যেন সংক্ষেপিত সংস্করণ। মূলের সেই আস্বাদ, মন্দাক্রান্তার সেই ধীরমন্থর পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কি অপূর্ব কৌশলেই না অমিত্রাক্ষরের বন্ধনে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন ! ইহারই সমকালিক একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব একটু বিস্তৃতভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৯০ সালে লেখা— শান্তিনিকেতন হইতে (?) প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট।[১৮] ইহা যেন 'মেঘদূত' কবিতারই কবিকৃত ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়—পাঠকগণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির জন্য উহার কিয়দংশ, দীর্ঘ হইলেও, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে—

কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে— কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে— অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি না— এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী পর্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে করতে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়— সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে— সেইখানে চরম বিশ্রাম—সেই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাকলে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই— রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতাসুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্যের কোনোটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে রীতিমত Oriental রাজমাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্ছে। যক্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হয়তো ঠিক 'ড্রামাটিক' হয় না—একটা দক্ষিণে' ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্ করে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধহয় তার পক্ষে ঠিক হত কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি—মনটা উদাস হয়ে আছে। আমাদের একবার মেঘের মতো মহাস্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্যের বর্ণনা কি তেমন ভালো লাগত! আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর কাজকর্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চলচে না— তবুও আমি বন্ধ হয়ে আছি ছুটি পাচ্ছিনে! আজ এই কর্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘদিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়— আজ তো আর কোনো দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই — সংসারের সহস্র ছোটোখাটো কর্তব্য আজকের এই মহা-দুর্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে— আজ তেমন সুযোগ থাকলে কে ধরে রাখতে পারত? যে সকল নদী গিরি নগরীর সুন্দর বহু প্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আসতুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুনলেই টের পাওয়া যায় কত ভালোবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নাম-গুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য আছে। রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্বিন্ধ্যা;— চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী,

উজ্জয়িনী ; এদেরই সকলের উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যুথীবনে বৃষ্টি পড়চে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্ছে। এদের জম্বুকুঞ্জে ফল পেকে আকাশের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছে— দশার্ণ গ্রামের চতুর্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে— সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুলতে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থ ঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে— রাজপথের অন্ধকার এমনি প্রগাঢ় যে স্থচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল তাহলে এসব দেশ না দেখে কি যাওয়া যায় ? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত— যক্ষ যদি উনবিংশ শতাব্দীর হয় তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মতো তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিকসম্প্রদায় থাকত তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত— তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্ক্রিপ্টিভ্, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিকদের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে— ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলছি, dramatic হয়নি, কিন্তু আমার বেশ লাগচে। আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে—যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশ-দেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত তাদেরও তো বিরহব্যথা ছিল—এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের Terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী স্টেশনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল, সে সময়কার নানা বিরহকে নানা দেশ বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই তার জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল—এজন্য হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয়নি—কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি তো বলতে পারি এতে খুসি আছি।…অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে, কেবল ক্রিটিককে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হবে—আজকের সমস্ত সংসার দুর্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে!”[১১]

কবির দিক দিয়া বিচার করিলে কাব্যনির্মাণের মূল উৎস যদি নবনবোন্মেষশালিনী

প্রজ্ঞা হয়, যে প্রজ্ঞার সহিত কবিচিত্তের উচ্ছলিত রসাবেশ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সহৃদয়ের দিক দিয়া বিচার করিলেও কাব্যপাঠের চরম লক্ষ্য হইল অনুরূপ প্রজ্ঞার বলে কবিবর্ণিত অর্থের সহিত পরিপূর্ণ তন্ময়ীভাব প্রাপ্তি। সৃষ্টিক্ষণে কবি যে রসাবেশে বিবশ হইয়াছিলেন, আস্বাদক্ষণেও সেই রসাবেশেরই সহৃদয়চিত্তে আবির্ভাব যখন সম্ভব হয়, তখনই কাব্যানুশীলন হয় সার্থক। যে সমালোচনার মধ্য দিয়া কাব্যসৃষ্টির সেই মূলীভূত প্রেরণার সহিত তন্ময়ীভবনযোগ্যতা পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হইয়া থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা বলিয়া স্বীকৃত হইবার দাবি রাখে। কাব্যের মূল বীজ যেমন কবির সৃষ্টিধর্মী কল্পনাশক্তির মধ্যেই নিহিত আছে, সেইরূপ কাব্যের সফলতাও পাঠকচিত্তে অনুরূপ সুপ্ত কল্পনাশক্তির উদ্বোধনেই, তাহার ধীশক্তি বা নীতিবোধের উন্মেষসাধনে নয়।[২০] শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তাই সর্বক্ষেত্রে কবির কাব্যনির্মাণের মূলীভূত শক্তির সহিত পাঠকচিত্তের তন্ময়ীভাব-সাধনে প্রধান সহায়ক। কাব্যের বহিরঙ্গ কারুবৈচিত্র্য বা নৈতিক বা দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে আধুনিককালের একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি-সমালোচকের অভিমত প্রাসঙ্গিক-বোধে উদ্ধার করিলাম—

"There can be only two valuable kinds of criticism. The first aims simply to erect signposts for the reader, to help him over difficult places, and to make him feel that the journey is worth undertaking. The second, creative criticism, is rare as any other form of creative writing. Where the critic has studied an author, lived with him in the spirit over a long space of time, become saturated with him, an affinity may grow up between them, so that some of the original power of the master is transmitted to the disciple."[২১]

রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত-সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় যেন তিনি সত্যই কালিদাসের যুগ ও পরিবেশের মধ্যে কল্পনাবলে নিজেকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, যথার্থই "lived with him in the spirit over a long space of time, become saturated with him." হৃদয়ের যে রসোচ্ছল মুহূর্তে কালিদাস তাঁহার অমর-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তটিকে যেন পরিপূর্ণরূপে আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয়



নাই, কবিহৃদয়ের কোন্ বিহ্বলতা 'মেঘদূতে'র গম্ভীর মন্দাক্রান্তার প্রতিটি ছত্রে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কোনো তত্ত্বোপদেশ, বা প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সন্নিবেশের কবিত্বপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কোনো তাগিদেই তিনি এই খণ্ডকাব্যটি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; নববর্ষার বিরহের যে অব্যক্ত বেদনা যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রেমিকহৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া থাকে, সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন বিরহের অন্তর্নিরুদ্ধ ব্যাকুলতাই এই অপূর্ব কাব্যখণ্ডে শাশ্বত বাণীরূপ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাই যখনই নববর্ষার নিবিড় মেঘাড়ম্বরের মধ্যে প্রিয়জনপরিবৃত হইয়াও আপনাকে একাকী নির্বাসিত বলিয়া মনে হয়, তখন মনের সেই অনির্দেশ্য ভাবটিকে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইলে রসিকজন আজও 'মেঘদূতে'র মেঘমন্দ্র শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই যেন চরম সফলতা লাভ করে, তাহার হৃদয়ের অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা যেন সেই আবৃত্তির মাধ্যমেই পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করিয়া প্রশান্ত পরিণতির মধ্যে লীন হয়।[২২] সমালোচক-সম্প্রদায় যখন মেঘের গতিপথ ঠিক বিজ্ঞানসম্মতরূপে নির্দিষ্ট হইল কিনা, বিরহী যক্ষের পক্ষে মেঘকে দূতরূপে প্রেরণ করিবার কল্পনা যুক্তিসংগত হইল কিনা—ইত্যাদি নানাবিধ গুরুগম্ভীর বিষয়েব সমাধান লইয়া ব্যস্ত থাকেন তখন কালিদাসের লোকান্তরিত আত্মা বোধ হয় কৌতুক বোধ করেন! যক্ষ মিথ্যা হউক,[২৩] মেঘের গতিপথ আদৌ আবহতত্ত্বসম্মত না হউক,[২৪] বিদিশা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, দশার্ণ, মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতি, দেবগিরিশিখরে বাসবীচমূর অধিনায়ক স্কন্দের নিকেতন, কুবেরের রাজধানী অলকা ও যক্ষের বাসভবন--সবই মিথ্যা হউক, কাল্পনিক হউক, ক্ষতি কি? মহাকবি কি তাহা জানিতেন না? কিন্তু এইসকল অবাস্তব কল্পনারাজির ভিতর দিয়া যে শাশ্বত সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কোনো হৃদয়বান্ পাঠকই কি অস্বীকার করিতে পারেন? তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন তাজমহলকে শুধু শাজাহানের ব্যক্তিগত প্রেমের প্রকাশরূপে না দেখিয়া চিরন্তন দাম্পত্যপ্রেমেরই মর্মরপ্রকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন, মেঘদূতকেও তেমনি বিশিষ্ট কাল বা দেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধরূপে না দেখিয়া তিনি উহাকে প্রেমিকহৃদয়ের চিরন্তন বিরহবেদনার শাশ্বত বাঙ্‌ময় প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তাজমহলকে উদ্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন—

> রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
> গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
> যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী

রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।[২৫]

যক্ষকে উদ্দেশ করিয়াও অনুরূপভাবেই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

হে যক্ষ, তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে,…
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।[২৬]

সত্যই, 'মেঘদূতে' যক্ষের বিরহবেদনা যেন ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; কোনো এক অজ্ঞাতনামা সংস্কৃত কবি যে বলিয়াছেন—

সঙ্গমবিরহকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥

বিরহের সেই বিশ্বব্যাপী সার্বভৌম রূপই যেন মেঘদূতের প্রতিটি ছত্রে দেদীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শুধু নায়কনায়িকার বিরহই 'মেঘদূতে' চিত্রিত হইয়াছে তাহা নহে, যখনই কোনো প্রিয়বস্তুর অদর্শনে আমরা বিমনায়মান হই, তখন সেই প্রিয় বস্তুকে পাইবার জন্য, তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমাদের হৃদয়ের যে গভীর আকুতি, তাহাই যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দে।[২৭] শুধু দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষাই নয়, দৈহিক সম্ভোগের স্পর্শশূন্য যে আধ্যাত্মিক সমাগমোৎকণ্ঠা সর্বজাতীয় বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে, তাহারই বাণীরূপ 'মেঘদূত' কাব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

"মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিকপ্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহ-ব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ

কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে ; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।"[২৮]

তখন ভাবুক চিত্ত সায় না দিয়া পারে না। তখন মনে হয়, কবি যেন ধ্যানবলে মেঘদূতের মর্মটির সন্ধান পাইয়াছেন—যক্ষ, যক্ষপত্নী, মেঘ, মেঘের গতিপথ, অলকা, যক্ষের বাসভবন—এ'সবই যেন কল্পনার ইন্দ্রজাল ; 'মেঘদূত' শুধু কবিহৃদয়ের চিরন্তন romantic nostalgia'র অনবদ্য কাব্যরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন "মেঘদূত বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ।"

৭

উপসংহার

আমাদের বক্তব্য আর দীর্ঘ করিতে চাহি না। 'মেঘদূত' কাব্য যে চিরকাল সহৃদয় চিত্তকে আনন্দিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা উহার কোনো তত্ত্বকথার জন্য নহে। তাহা উহার অপরূপ শিল্প সৌন্দর্যের জন্য, উহার মর্মবাণীর সার্বকালিক ও সর্বজনীন আবেদনের জন্য। আজও তাই সংস্কৃত সাহিত্যরসিক সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়পটে 'মেঘদূতে'র প্রতিটি শ্লোক অনপনেয় অক্ষরে মুদ্রিত। তথাপি উৎকৃষ্ট কাব্য বিভিন্ন পাঠকের চিত্তে রুচির তারতম্য ও প্রকৃতিগত প্রভেদবশতঃ বিভিন্ন জাতীয় ভাব ও চিন্তার উদ্রেক করিয়া থাকে— শুধু সাহিত্যিক সৌন্দর্য আস্বাদন করিয়াই যেন আমাদের মন পরিতৃপ্ত হইতে চাহে না। 'মেঘদূত'ও তুল্যরূপে বিভিন্ন সহৃদয়চিত্তে কত বিভিন্ন প্রকারের আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে—তাহারই কয়েকটি নিদর্শন কৌতূহলবশে সংকলন করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপন করিলাম। তাঁহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে কোন্‌টি গ্রহণীয় তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কাব্যের তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে সিদ্ধান্তস্বরূপ যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে প্রাসঙ্গিকবোধে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া আমাদের বর্তমান আলোচনা সমাপন করিতে চাহি—

"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ-বা সৌন্দর্য, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। অনেকেই বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু, তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের

মধ্যে যদি বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম ফুল হইতে কেহ-বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ-বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ-বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ-বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ-বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন— আবার কেহ-বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না। যিনি যাহা পাইলেন, তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না— বিরোধে ফলও নাই।"[২৯]

১ তু° "যে প্রেম সম্মুখপানে···

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা" — ইত্যাদি।

২ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃ, ৫২৪। (বিশ্বভারতী সংস্করণ)।

৩ A. C. Bradley : *Oxford Lectures on Poetry*, p. 26.

৪ দ্র° Dr. R. C. Hazra : *Text and Interpretation of Some Verses of the Megha-duta*, Indian Historical Quarterly, Vol. XXV, No. 4.

৫ এই প্রসঙ্গে রাজশেখরের 'কাব্য-মীমাংসা' হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, "তত্র 'বর্ষাসু পূর্বো বায়ুঃ'-ইতি কবয়ঃ। 'পাশ্চাত্যঃ, পৌরস্ত্যস্তু প্রতিহন্তা'— ইত্যাচার্যাঃ। তদাহুঃ—

'পুরোবাতা হতা প্রাবৃট্ পশ্চাদ্বাতা হতা শরৎ।' — ইতি।..

'বস্তুবৃত্তিরতন্ত্রং, কবিসময়ঃ প্রমাণম্'— ইতি যাযাবরীয়ঃ।' —*Kavyamimamsa*, Chapter XVIII (GOS Edn.), p. 99. "The wind originates in the eastern horizon. The Acaryas think that the wind originates from the West in the rainy season, and that by the eastern wind the clouds are dispersed and therefore the rains are obstructed."— ঐ *Notes*, p. 255 (Third Edn. 1934).

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শাস্ত্রিমহাশয়ের জীবনীতে 'মেঘদূত' সম্পর্কে নিম্নলিখিত রচনাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়—১. মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৩০৯ সাল। ২৫ জুন ১৯০২) পৃ. ৮৮; ২. 'মেঘদূত', ক্ষিতিনাথ ঘোষ। ভাদ্র ১৩৪১। হরপ্রসাদ লিখিত পূর্বাভাষের তারিখ— জানুয়ারি ১৯৩০। ৩. 'মেঘদূত' (সমালোচনা): বঙ্গদর্শন, ১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন। দ্র° সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৩।

৭ দ্র° 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ), পৃ. ১৯৭।

৮ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৯৮।

৯ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০১।

১০ তু° "এতেন কস্যাশ্চিৎ কামুক্যাঃ প্রিয়তমচরণপাতোঽপি ধ্বন্যতে।" —মল্লিনাথ।

১১ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০৬।

১২ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০৭।

১৩ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৯৮।

১৪ দ্র° ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা— ৭৩)' পৃ. ৩৯-৪০। তু°— "প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবেরের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন ; তিনি সে দিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিলে হয়ত সুরুচিসম্পন্ন আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্গালা কাগজ সম্পাদক মহাশয়েরা বলিবেন এ প্রবন্ধ-লেখকের রুচি-পরিবর্তন আবশ্যক, তিনি একখানি বাঙ্গালা অনুবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক অশ্লীলতার অবতারণা-করতঃ আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য সাময়িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত। সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে তাঁহারা যেন উত্তর মেঘের ৫, ৭ এই দুইটি কবিতা প্রণিধানপূর্বক পাঠ করেন।"—৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদের শাস্ত্রিমহাশয়কৃত সমালোচনা হইতে। দ্র° হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, পৃ, ৪৭২।

১৫ দ্র° বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, পৌষ, ফাল্গুন।

১৬ দ্র° 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ), পৃ, ১৯৯।

১৭ 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী' পৃ ১৯৯-২০০।

১৮ 'মানসী'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' কবিতার রচনাকাল— "শান্তিনিকেতন। ৭।৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯০। অপরাহ্ণে। ঘনবর্ষায়।"

১৯ দ্র° চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৪৩।

২০ তু° "Lastly—and this is Shelley's central argument—as poetry itself is directly due to imaginative inspiration and not to reasoning, so its true moral effect is produced through imagination and not through doctrine . . It strengthens imagination as exercise strengthens a limb, and so it indirectly promotes morality."—A. C. Bradley : *Shelley's View of Poetry* : *Oxford Lectures on Poetry*, p. 171.

২১ C. Day Lewis : *A Hope for Poetry*, p. 32.

২২ তু° "মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।" —'নববর্ষা' : সংকলন, পৃ, ২২০।

২৩ কোনও কোনও পণ্ডিত নির্বাসিত যক্ষের চরিত্রে কালিদাসেরই জীবনের একটি অজ্ঞাত ঘটনার প্রতিবিম্বন অন্বেষণ করিয়াছেন। খৃঃ ১৪শ শতকের মধ্যভাগে মালয়ালম্ ভাষায় রচিত ব্যাকরণ ও

অলংকারবিষয়ক গ্রন্থ 'ললিত-তিলকে' একটি শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটি নিম্নলিখিতরূপ—

সন্দ্রে পূর্বং মহিত-নৃপতেবিক্রমাদিত্যনাম্নঃ
পোক্তাং চক্রে তরুণ-জলদং কালিদাসঃ কবীন্দ্রঃ।

এ বিষয়ে পিশারোটি মহোদয়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"This verse tells us that Kalidasa sent a cloud as a messenger to his beloved, who was the sister of the great Vikrama. It is very legitimate to hold that the reference here is to *Meghasandesa*; and that means that the hero of the exquisite lyric was none other than the prince of Indian bards,—while the heroine was the sister of his own patron.

"The identity of the author and the hero has already been established by a Malayali commentator of the lyric in his unpublished commentary, called *Varavarnini*, and he quotes this verse in further support of the position he has taken."—K. R. Pisharoti: *Meghasandesa—A Note* (*Indian Historical Quarterly*, Vol. XVII, 1946, p. 517). অপিচ—" . . I retain, however, a feeling that the poem has a touch of autobiography, and may be based upon some incident in Kalidasa's own career, whereby he had incurred the displeasure of a royal patorn. The peem would then be in one aspect an indirect conciliative. No one would say that this is not in harmony with Kalidasa's literary cleverness, which is as markedly characteristic of him as his delicacy."—Dr. F. W. Thomas: *J.R.A.S.*, 1918, pp. 118-122.

২৪ 'মেঘদূতে' বর্ণিত মেঘের গতিপথের সহিত রামায়ণবর্ণিত সীতান্বেষণোৎসুক বানরসেনাপতিগণের উদ্দেশে সুগ্রীব কর্তৃক বর্ণিত উত্তরাভিমুখী যাত্রাপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের 'কাব্য-কৌতুক' গ্রন্থে সংকলিত 'বাল্মীকি ও কালিদাস' শীর্ষক প্রবন্ধের 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' দ্রষ্টব্য।

২৫ বলাকা, কবিতা-সংখ্যা ৯।

২৬ শেষসপ্তক, সংযোজন ('যক্ষ')। দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃ, ১২১-১২২।

২৭ তু° 'মেঘদূত' প্রবন্ধ: সংকলন, পৃ. ১০৪-১০৭: "কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। ..."— ঐ. পৃ. ১০৬।

২৮ দ্র° 'মেঘদূত': সংকলন, পৃ. ১০৫-৬।

২৯ দ্র° পঞ্চভূত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮১ শক ॥

কালিদাসের ধর্মমত

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির জীবনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতই সীমাবদ্ধ যে, সে-বিষয়ে কোনও কিছুই জোর দিয়া বলিবার উপায় নাই। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, কালিদাস পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; অপর এক দল পণ্ডিতের মতে, গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা তিনি অলংকৃত করিয়াছিলেন। এইভাবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অপরার্ধ পর্যন্ত দুই কালসীমার মধ্যে কালিদাসের আবির্ভাব কাল দোলায়িত হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। তবে শেষোক্ত মতই যে অধিকতর সমীচীন তাহা ঐতিহাসিক বিভিন্ন সাক্ষ্য এবং কালিদাসের রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে মোটামুটিভাবে প্রমাণ করিতে পারা যায়। কালিদাসের ধর্মমত সম্বন্ধীয় আলোচনা এই বিষয়ে কতখানি আলোকপাত করিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

২

কালিদাস যে কয়খানি কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন, সেগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি শৈব-মতাবলম্বী ছিলেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের নান্দীশ্লোকে তিনি 'অষ্টমূর্ত্তিধর ঈশে'র আবাহন করিয়াছেন; শকুন্তলার প্রসিদ্ধ নান্দীশ্লোকেও সেই 'অষ্টমূর্ত্তিধর' মহাদেবেরই স্তব দেখিতে পাওয়া যায়; 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' নাটকের নান্দীতেও 'স্থিরভক্তি-যোগ-সুলভ স্থাণুর'ই আবাহন পরিলক্ষিত হয়— যিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, একমাত্র যিনিই 'ঈশ্বর' শব্দের অনন্য অভিধেয়, এবং যিনি মুমুক্ষু যোগিগণের পরম উপাস্য। শুধু নাটকের প্রস্তাবনাংশেই নহে, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র অন্তিম ভরত-বাক্যেও মহাকবি 'আত্মভূ নীল-লোহিতে'র উদ্দেশে 'পুনর্ভব' হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

শ্রব্যকাব্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা মহাকবির শিবভক্তির অজস্র

নিদর্শন দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ॥

পার্বতী ও পরমেশ্বরকে কবি এই শ্লোকে বিশ্বের জনক-জননীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের বিষয়বস্তুও পার্বতী এবং মহাদেবের প্রণয়-লীলাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। 'রঘুবংশে'র ত্রয়োদশ সর্গে যে-স্থলে মহাকবি গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের বর্ণনা করিতেছেন, সেখানেও কালিন্দীর ঘননীল প্রবাহের সহিত ভাগীরথীর শুভ্র স্রোতের অপরূপ মিশ্রণের দৃশ্য দেখিয়া কবিচিত্তে পরমেশ্বরের 'কৃষ্ণোরগভূষণ' 'ভস্মাঙ্গরাগ' তনুর সাদৃশ্য-কল্পনা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—

কচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

'মেঘদূতে'ও কৈলাসের শুভ্র তুষারমৌলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'ত্র্যম্বকের রাশীভূত অট্টহাসে'র সহিত উপমাই স্বভাবতঃ কবির মনে জাগিয়াছে—

"শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥"

এইভাবে আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই দেখিতে পাইব পরমেশ্বর মহাদেবের প্রতি কালিদাসের চিত্ত যেন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল। 'কুমার-সম্ভবে'র পঞ্চম সর্গে পার্বতীর মুখ দিয়া মহাদেবের অলৌকিক মহিমার যে প্রশস্তি উৎসারিত হইয়াছে মনে হয় তাহার মধ্য দিয়া যেন মহাকবির নিজের মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।[১]

৩

কিন্তু কালিদাসের শিবভক্তির এই সকল নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শন সত্ত্বেও তাঁহার রচনার বিভিন্ন স্থলে বিষ্ণূপাসনার প্রতি মহাকবির পক্ষপাতও লক্ষণীয়। 'কুমার-সম্ভব' যেমন কালিদাসের শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক, 'রঘুবংশ' মহাকাব্য-খানিও অনুরূপভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তির সাক্ষ্য বহন

করিতেছে। 'রঘুবংশে'র দশম সর্গের অন্তর্গত দেবগণকর্তৃক শেষশয্যাশায়ী আদিপুরুষ বিষ্ণুর স্তব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[২] এই স্তবে পরমপুরুষ নারায়ণের প্রতি ভক্তি যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি কবি বৈষ্ণব ছিলেন? আবার 'কুমার-সম্ভবে'র দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবগণ যেভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যেন তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মারই উপাসক।[৩] বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি এই সমপক্ষপাত ভক্তি কালিদাসের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'কুমার-সম্ভবে'র একটি শ্লোকে মহাকবির ধর্মমত সম্বন্ধীয় এই উদার মনোভাবের কারণ বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥[৪]

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরভেদে এই ত্রিমূর্তি যে বিশ্বসৃষ্টির আদি-নিদান অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশভেদ মাত্র, ইহা 'কুমার-সম্ভবে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ ভেদমুপেয়ুষে॥[৫]

সুতরাং মহাকবি তাঁহার কাব্যে যে মূর্তিরই উপাসনা করুন না কেন, তিনি যে উহার মাধ্যমে সেই আদিকারণ পরমাত্মা ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেছেন, এই বিষয়ে তাঁহার মনে কোনওরূপ সংশয় বা দ্বিধা ছিল না। ধর্মমতের দিক দিয়া তিনি যেমন এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপাসনাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ দার্শনিক বিচারবুদ্ধিও তাঁহাকে সেই অদ্বিতীয় ভেদরহিত ব্রহ্মতত্ত্বেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদেই সকল বিরোধী মতের সমন্বয় সম্ভব—কালিদাসের ধর্মবোধও তাই সেই অদ্বৈততত্ত্বের উপাসনার মধ্যেই পরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। তবে যে তিনি শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার উপাসনাতেই আপনাকে মগ্ন রাখিয়াছেন বলিয়া আপাত প্রতীতি হয়, তাহা শুধু মানবের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তির স্ফূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মহা-বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য মধুসূদন সরস্বতী যেমন স্বগ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব হইতে বিরত হন নাই[৬], এবং দ্বৈতজ্ঞানমূলক উপাস্য-

উপাসকভাব যেমন তাঁহার অদ্বৈতবোধের পরিপন্থী নহে, সেইরূপ কালিদাসের ক্ষেত্রেও আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে যে ত্রিমূর্তির উপাসনার নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার অদ্বৈতবোধের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহা এই : যদিও কালিদাস তাঁহার কাব্যে ত্রিমূর্তির উপাসনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি বুদ্ধিকৃত প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তথাপি সহৃদয় পাঠকের নিকট বিভূতি-ভূষিত যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবের তপোনিরত মূর্তিই তাঁহার কবিহৃদয়কে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়াছিল, এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। 'রঘুবংশে'র দ্বাদশ সর্গের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে তিনি যেভাবে রাবণের শিবভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না—

জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চিতেশ্বরম্।
রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত ॥[৭]

সুতরাং এই দিক বিচার করিলে কালিদাসকে শৈব বলিয়া নির্দেশ করাও খুব অসংগত হইবে না।[৮]

8

প্রত্যেক কবিই তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া ন্যূনাধিকভাবে স্ব স্ব দেশের ও কালের বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন এই বিষয়ে কোনও বৈমত্য থাকিতে পারে না। কালিদাসের ক্ষেত্রেও যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিলাম, ধর্মবোধের দিক্ দিয়া কালিদাসের চিত্তে একটা সমন্বয়ী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল ; দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়স্পৃহা তুল্যভাবেই লক্ষণীয়। এই সমন্বয়বুদ্ধি কতখানি কালিদাসের সমসাময়িক যুগের ধর্মীয় চিন্তা ও অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়। যাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার ধারা লইয়া বিশেষভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে গুপ্তযুগেই এই সমন্বয়প্রতিভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। এ বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের উক্তি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করিতেছি—

"It will be clear from our survey of the epigraphic evidence that the Gupta age was essentially one of religious harmony and

toleration. Brahmanism, Buddhism, and Jainism were the three principal religions, which flourished side by side, though the popularity of each might have varied. Brahmanism was predominant, and its popular phase was Vaisnavism. Barring one or perhaps two exceptions, the Gupta monarchs themselves were devotees of Visnu, who is called, apart from the names already given, Vasudeva, Narayana, Govinda, Gadadhara etc. Other forms of Brahmanism were the worship of Siva (or Sambhu, Bhutapati, Sulapani, Mahadeva, Pinakin, Hara, etc.) ; Sun (Surya) ; Kartikeya (or Skanda, Svami-Mahasena) ; the divine Mothers (Bhagavati etc.) ; Goddess Laksmi ; and a host of other deities, both male and female..."[৯]

গুপ্তযুগের বিভিন্ন ধর্মমতের এই বিরোধলেশশূন্য সহাবস্থান এবং পরস্পর সহিষ্ণুতার চিত্র কালিদাসের রচনাবলীতে কেমন নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শুধু ধর্মবোধের দিক দিয়াই নহে, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, বিলাসব্যসন, সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শ, দার্শনিক মনীষা প্রভৃতি সমকালীন জাতীয় জীবনের বহু-বিচিত্র প্রকাশ কালিদাসের রচনাবলীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা আধান করিয়াছে! সেই অখণ্ডতার স্বরূপ মনীষী শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অনবদ্য বাগ্‌ভঙ্গীতে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিয়াই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা সমাপন করিলাম—

"Such was the age of Kalidasa, the temper of the civilisation which produced him ; other poets of the time expressed one side of it or another, but his work is its splendid integral epitome, its picture of many composite hues and tones. Of the temperament of that civilisation the Seasons is an immature poetic self-expression, the House of Raghu the representative epic, the Cloud Messenger the descriptive elegy, Shakuntala with its two sister love plays intimate dramatic pictures and the Birth of the War-God the grand religious fable"[১০]

১ দ্র° কুমার° ৫. ৭৫-৮৩।

২ দ্র° রঘু° ১০. ১৬-৩১।

৩ দ্র° কুমার° ২. ৪-১৫।

৪ ঐ. ৭. ৪৪। "এই তিন দেব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইঁহারা একই শরীর, কেবল তিন মূর্তিরূপে পৃথক্ হইয়াছিলেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রধানও বটেন, অপ্রধানও বটেন। কথনও বিষ্ণু অপেক্ষা শিব প্রধান, কথন শিব অপেক্ষা বিষ্ণু, কথন ব্রহ্মা তাঁহাদিগের উভয়ের অপেক্ষা, কথন বা তাঁহারা উভয়ে শিব অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়েন।"—অনুবাদ।

৫ ঐ. ২. ৪। "যিনি সৃষ্টির পূর্বে একক রূপে বিরাজমান ছিলেন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের আশ্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তিন মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নমস্কার।"—অনুবাদ।

৬ তুলনীয়ঃ "বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"
—গীতাব্যাখ্যার অন্তিম মঙ্গল-শ্লোক।

৭ রঘু° ১২,৮৯। "যিনি লোকপালগণকে জয় করিয়াছিলেন, যিনি নিজের শিরঃশ্রেণীর দ্বারা পরমেশ্বর মহাদেবের অর্চনা করিয়াছিলেন, এবং যিনি কৈলাসশিখরকে উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলেন—পরমশত্রু সেই রাবণের প্রতি রামচন্দ্র বহুমান পোষণ করিয়াছিলেন।"—অনুবাদ। এই প্রসঙ্গে C. Sivaramamurti রচিত *Ravana in the Kailasa Temple at Ellora* শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (*Journal of the Ganganath Jha Research Institute*, Vol, VIII Pt.2.)।

৮ তুলনীয়: "Indeed, he regards all these gods only as manifestations of the Highest One, making his religious creed amount to Saivite Vedanta."—G. C. Jhala : *Kalidasa—A Study* (1949), p. 23.

৯ দ্র: Rama Shankar Tripathi : *Religious Toleration under the Imperial Guptas* (Indian Historical Quarterly, 1939, Vol. XV, No. 1).

১০ Sri Aurobindo : *Kalidasa*, pp. 22-23 (*First Series*).

রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বিকাশে উপনিষদের মন্ত্ররাজির প্রভাব ছিল অতিশয় দূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"The writer has been brought up in a family where texts of the *Upanishads* are used in daily worship; and he has had before him the example of his father, who lived his long life in the closest communion with God, while not neglecting his duties to the world, or allowing his keen interest in all human affairs to suffer any abatement."[1]

উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রমানসের সম্পর্ক এতই সুনিবিড় যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। প্রসিদ্ধ সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, তাঁর চিত্তের ও চেতনার গড়নে তিনটি—কি চারটি—ধারা প্রবহমান; এ কয়েকটি মিলে মিশে তাঁর কবিস্বভাবের, তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য গড়ে দিয়েছে। ধারা কটি হল—প্রথম, উপনিষদের ধারা; দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-ভাবের ধারা; তৃতীয়, 'পেগান' (Pagan) অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যভোগের ধারা; আর চতুর্থ যোগ করা যেতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা যুক্তিবাদের ধারা।

"আমরা মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষা ধার করে বলতে পারি ঔপনিষদ-ভাব রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতর বুদ্ধিকে ভাস্বর করেছে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁর নিম্নতর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে অপরূপ মোহিনী শক্তিতে ভরে দিয়েছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বাহ্য মানসসত্তাকে, মস্তিষ্কের পরিধিকে পরিপূর্ণ করে সকলকে ঘিরে—অনেকসময়ে সূক্ষ্মভাবে—একটা ব্যাপক আবহাওয়া রচে দিয়েছে।"[2]

কিন্তু আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রপ্রতিভার একটিমাত্রই মূল ধারা—তাহা হইতেছে উপনিষদের ধারা, এবং অন্যান্য সকল ধারা, তাহাদের আপাতবিভিন্নতা সত্ত্বেও, সেই মূল ধারারই উপ-প্রবাহ বা শাখা মাত্র। কেননা, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ও যে-দৃষ্টিতে উপনিষদের মন্ত্ররাজিকে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতার রূপ আছে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, ভক্তি, সৌন্দর্যসম্ভোগ, বিশ্ববোধ—

মানবমনের যত কিছু বহুমুখী বিচিত্র বৃত্তি, সমস্তই উপনিষদের মন্ত্রের অক্ষয় উৎস হইতে আপন আপন চরিতার্থতালাভের উপাদান সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে ইহাই ঘটিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করা খুব দুরূহ নহে।

২

যদিও প্রধান প্রধান উপনিষদের শাশ্বত বাণীসমূহই নির্বিশেষে রবীন্দ্রজীবনে জ্ঞান, কর্ম, প্রেম ও ভক্তির অজস্র উল্লাসের অক্ষয় প্রেরণা জোগাইয়াছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাষণ ও লিখিত প্রবন্ধে উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্রেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঋষিবাণীগুলি যেন তাঁহার পরিপূর্ণ জীবনসংগীতের কয়েকটি ধ্রুবপদের মতো বার বার আবর্তিত হইয়া ফিরিয়াছে। এইগুলিই যেন তাঁহার জীবনসাধনার সর্বপ্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ঐরূপ কয়েকটি মন্ত্রের নির্দেশমাত্র করিব।

ক. গায়ত্রী মন্ত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। ···তাই বলিতে-ছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে, সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি

নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"[৩]

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রীমন্ত্রের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অধ্যাত্মজগতের সহিত বাহ্যজগতের, জড়ের সহিত চৈতন্যের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যে এই আর্ষবাণীর উদ্দেশ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণে বলিতেছেন—

"আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী, আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃ স্বঃ-কেও সৃষ্টি করছেন, আর-এক দিকে আমাদের ধী-শক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।"[৪]

আবার—

"বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে এক রূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"[৫]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও এই গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব ছিল গভীর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে— ..."[৬]

খ. 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্—'

ঈশোপনিষদের এই প্রথম মন্ত্রটি মহর্ষির অধ্যাত্মজীবনের রুদ্ধ দ্বার কিভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার আত্মজীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারি। জগতের অতি তুচ্ছতম পদার্থও যে ঈশ্বরের শাশ্বত সত্তার দ্বারা ওতপ্রোত-ভাবে আচ্ছন্ন, তাহা এই মন্ত্রটিতে অপূর্ব ভঙ্গীতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও

তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্তে এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিরন্তর ধ্যান করিতেন, এবং তাঁহার জীবনকে ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস করিতেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে একটি ভাষণে কবি বলিতেছেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

"যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত, এবং আকাশের অনন্ত-আরতি-দীপের কোনোদিন নির্বাণ নাই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে—পিতামাতার গভীর স্নেহে—মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে—ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো! মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ, কোনো লোভ না আসুক। পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।"[৭]

কবির প্রাত্যহিক জীবনচর্যার গুপ্ত রহস্য যেন উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রব্যাখ্যানের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

গ. 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি ছিলেন, সেইরূপ অনলস কর্মীও ছিলেন। কর্মযোগের পথেই যে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা, এবং তাঁহার জীবনও সেই সত্যেরই নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উপনিষদের মন্ত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সত্য-উপলব্ধির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—এই মন্ত্রটিও সেই সত্যেরই প্রকাশ মাত্র। এই মন্ত্রটির তাৎপর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"উপনিষৎ বলেছেন: কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শতবৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে

উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, 'আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে।' তাঁরা সংসারের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখতাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখদুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান।"[৮]

ঘ. প্রাণস্তুতি

"প্রাণো মৃত্যুং প্রাণস্তক্মা। নমস্তে অস্তু আয়তে। নমো অস্তু পরায়তে। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়। নমস্তে প্রাণ স্তনয়িত্নবে। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে। নমস্তে প্রাণ বর্ষতে॥"

এই মন্ত্রসন্দর্ভে জগতের নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্ন বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহের যে আবাহন ঋষিকণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন। সর্বত্রই প্রাণের স্ফূর্তি!—

"প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বাস করেছেন, তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিও প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের উদার দর্শনের সমগোত্রীয় ছিল; তাই পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির নিত্য বিবর্তনের বিচিত্র লীলা তিনিও সমান আবেগ ও উল্লাসের সহিত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

ঙ. 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।'

পরমচৈতন্যের বিশ্বব্যাপক সত্তা, যাহা উল্লিখিত মন্ত্রটিতে ধ্বনিত হইয়াছে,

তাহা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নিকট তাই মন্ত্রটির আকর্ষণ এত বেশী ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি ভাষণে উল্লিখিত মন্ত্রটির যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে তিনি কি গভীরভাবে এই মন্ত্রের তাৎপর্য প্রণিধান করিয়াছিলেন—

"পূর্ব ছত্রে আছে, যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন—তার পরে আছে, যিনি ওষধিতে, বনস্পতিতে, তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

"হঠাৎ মনে হতে পারে, প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন, তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি-বনস্পতির নাম করা হল?

"বস্তুত, মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি। এ কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না! কিন্তু, তার পরেও যে ঋষি বলেছেন 'তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন' সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি মননের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন—তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান—তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তাদের স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল—তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর, কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

"তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না। কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন?"[১০]

কবিচিত্তের এই আকৃতি যে অপরিতৃপ্ত থাকে নাই, তিনি যে সত্যই সেই প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় অদ্বিতীয় মহান্ দেব, সর্বব্যাপক আত্মচৈতন্য বা পরব্রহ্মের বিশ্বব্যাপক সত্তা আপনার অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কবির নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটি হইতে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে—

"আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহু যুগের মূক আনন্দ

আজ ভাষা পাইয়াছে—নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করিতে চাই। আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে, যেন এই জলস্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ— সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন—আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি মানুষ, এই জন্যই আমি ধূলামাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই—ইহা আমার গৌরব—আমার চেতনার জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে—আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে।...”[১১]

উপনিষদের ঋষিকণ্ঠ নিঃসৃত বাণীর সহিত কবির এই আত্মোপলব্ধির কি নিবিড় ঐক্য! সত্যই, “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

চ. মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা ঃ ‘যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।’

বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গত যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীর করুণ প্রার্থনামন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব করুণ-মধুর অনুভূতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

“যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্বলাভ করিতে না পারিব, তাহার দ্বারা আমার কি প্রয়োজন, আমি তাহা লইয়া কি করিব?”

মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাটিকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

“উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ একপ্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।”[১২]

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তও সর্বদাই সেই অমৃতের স্পর্শ, সেই ভূমার উপলব্ধির সন্ধানে নিরন্তর ব্যগ্র ছিল। কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোনও ক্ষুদ্র লাভ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই—

"গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা। অধরার গেছি পিছু পিছু।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইহাই মূল কথা। এই অমৃতত্ব-স্পৃহা যে একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না।...এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি: যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌।

"মৈত্রেয়ীর এই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনও শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের এই একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কণ্ঠে চিরন্তন কালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সর্ববিধ সংকীর্ণতার প্রতি বিমুখতা—মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাবাণীর সহিত একাত্মতাসূত্রে গ্রথিত, ইহা তাঁহার জীবনসাধনার অঙ্গ, কোনও খ্যাতিলিপ্সার দ্বারা প্রণোদিত নহে।

ছ. 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দী ভবতি।'

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম শুদ্ধমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি abstract তত্ত্বমাত্র নহে, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়াই ব্রহ্ম আপন "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া" ও আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দরসসমুদ্রে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃতির

অফুরন্ত রসসমুদ্র ও আনন্দমহাপ্লাবনের সঞ্জীবনীধারায় অবগাহন করিয়া আপন কবি-প্রকৃতিকে চিরসঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন; তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ব্রহ্মানন্দেরই উৎসারস্বরূপ। 'কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ', 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' ইহাই ছিল মহাকবির উচ্ছ্বসিত জীবনসংগীত। উপনিষদের ঋষিকবিগণও ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপ দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি"—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রবর্ণটিতে। কবি, শিল্পী, জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত—প্রত্যেকেই সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দের কণামাত্র তাঁহাদের কাব্যের মাধ্যমে, শিল্পের মাধ্যমে, জ্ঞানসাধনার ভিতর দিয়া, নিরন্তর কর্মযোগের মধ্য দিয়া, ভক্তি ও প্রেমের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন—"এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি।" সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আমাদের কোনও প্রকার কর্মই বন্ধনস্বরূপ হইতে পারে না, যদি সেই কর্মের মধ্য দিয়া আমরা সেই ব্রহ্মের আনন্দাংশকে প্রকাশ করিতে পারি—

"And joy is everywhere ; it is in the earth's green covering of grass ; in the blue serenity of the sky ; in the reckless exuberance of spring ; in the severe abstinence of grey winter ; in the living flesh that animates our bodily frame : in the perfect poise of the human figure, noble and upright ; in living ; in the exercise of all our powers ; in the acquisition of knowledge ; in fighting evils ; in dying for gains we never can share."[১৪]

রবীন্দ্রনাথের এই জীবন-দর্শনের সহিত উপনিষদের ঋষিগণের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দবন্দনার কি গভীর সাজাত্য—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

জ. 'চরৈবেতি। চরৈবেতি।'

রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল নিত্য অগ্রগতির সাধনা, চলার সাধনা। তাঁহার ব্রহ্ম পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মধ্য দিয়াই নিয়ত বিবর্তনশীল, একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র স্থিতিশীল অপরিণামী তত্ত্বমাত্র নহে। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কত বিচিত্র সাধনার সমাবেশ; কোনও এক জায়গায় কবি থমকিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়েন নাই।

তাঁহার জীবনরথ 'লক্ষ্যশূন্য' বেগে নিরুদ্দেশের অভিসারে যাত্রা করিয়াছে, গৃহী হইবার বাসনা তাঁহার নাই—

গৃহী কহে, 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।' রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'
'কোন্‌খানে' শুধাইল। রথী কহে, 'কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।' 'কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে' গৃহী কহে।
'কোথাও না, শুধু আগে।' 'কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।'
'কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।'[১৬]

রবীন্দ্রসাধনার ইহা এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেখানেই তিনি অন্ধ কুসংস্কারের জড়তা দেখিয়াছেন, তুচ্ছ আচারের অচলায়তন যেখানেই তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই তিনি নির্মম কশাঘাত করিয়াছেন, অচলায়তনকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান শুনাইয়াছেন, অগ্রগতির বাণী তাঁহার কবিকণ্ঠ হইতে বজ্ররবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র শুনঃশেপোপাখ্যানের অন্তর্গত মহীদাস ঐতরেয়ের কণ্ঠবিনিঃসৃত গাথাগুলির অতি নিবিড় ঐক্য রহিয়াছে। তাই কবির নিকট এই গাথাগুলি অমূল্যরত্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল—

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিতশুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্‌বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥ চরৈবেতি॥
পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতশ্চরৈবেতি॥
আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি॥
কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি॥
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্যশ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি॥"[১৭]

এই প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"Tagore's restlessness, struggling for a better scheme of things, deep longing for an endless journey in the pursuit of the great

unknown—all this is ascribed to Tagore's intimate acquaintance with European thought of the 19th Century. It is not necessarily a symbol of Western influence on Tagore's mind, because the hymn of "Onward March" in *Aitareya Brahmana* shows that Indian thought and philosophy never stood for a stagnant order. Tagore's rebellious mind drank deep in the philosophy of movement, preached especially in *Aitareya Brahmana*···

"...The call of the eternal, this dynamic urge—all this gave shape to Tagore's thought and philosophy. He had never known rest; he had not advocated rest. That was why he had built up no cult of his own. He has moved on and on, without rest. This being the key-note of Tagore's thought, he is of the company of those spiritual rebels of ancient India."[১৮]

ঝ. 'ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥'

রবীন্দ্রনাথ কবি—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁহার ধর্মও কবির ধর্ম। "My religion is essentially a poet's religion"—ইহা কবিরই স্বকণ্ঠবিনিঃসৃত স্বীকারোক্তি।[১৯] অতএব তাঁহার পক্ষে ঐহিক বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে মায়া বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া, অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল। ইহা তাঁহার স্বভাব-বহির্ভূত। তিনি এই জগতের প্রত্যেক পদার্থকে, ইহার অনন্ত বৈচিত্র্যকে, ইহার আপাতবিরোধ ও বৈষম্যকে মানিয়া লইয়াছিলেন; কেননা, প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই তিনি পরম সত্য, আনন্দ-স্বরূপ, বিশ্বের একমাত্র নিধানভূত ব্রহ্মেরই লীলা অনুভব করিতেন। সীমার সহিত অসীমের, কর্মের সহিত মুক্তির, ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের কোনও বিরোধ তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই—সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে মধুময়, কেননা সমস্তই ব্রহ্মের ছায়া, 'যস্য চ্ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ'—অমৃতও যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া। অতএব ব্রহ্মের মধ্যে সকল

বিরোধের সমন্বয়, কেননা ব্রহ্ম অখণ্ড, অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্মবোধ যাঁহার ঘটিয়াছে, যিনি আনন্দের মধ্য দিয়া এই বিশ্বজগতের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কাছে ইহজগৎই মুক্তির লীলাক্ষেত্র—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিবান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" ইহজগতের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, ঐহিক সর্ববিধ বিষয়ের প্রতি আত্যন্তিক আনন্দময় শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম। উপনিষদের ঋষিগণেরও ইহাই বাণী, উদ্ধৃত মন্ত্রে তাহাই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

"একে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।"[২০]

বিশ্ববোধের উদ্বোধনেই উপনিষদের মন্ত্ররাজির তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধও তাই উপনিষদের উদার গম্ভীর মন্ত্রের মধ্যে আপন অনুভূতির সমর্থন লাভ করিয়া সকল বাধাকে নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল—

"ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানা দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশে এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোটোবড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করি। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও আর তার তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন, যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো।"[২১]

উপনিষদের মন্ত্ররাজি কিভাবে কবিচিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহারই কয়েকটিমাত্র নিদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংকলিত করিবার চেষ্টা করা হইল।

উপনিষদ্‌ যে রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল মননের বিষয় ছিল না, উপনিষদের ভাবধারা যে তাঁহার জীবনের অস্থি-মজ্জার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়া তাঁহার মর্ত্যজীবনের বিচিত্রমুখী সাধনার মূলে অক্ষয় প্রেরণার উৎসরূপে সতত বিরাজমান ছিল, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আর আমাদের বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।

১ দ্র° *Sadhana* : Author's Preface, p. vii

২ দ্র° নলিনীকান্ত গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৯৭ ('রবীন্দ্রপ্রতিভার ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

৩ জীবনস্মৃতি : 'পিতৃদেব' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪ দ্র° শান্তিনিকেতন ('ওঁ'), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩। (২ খণ্ডে পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ আলোচ্য।) তুলনীয় :

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥" —যাজ্ঞবল্ক্য।

উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"Now the প্রণব means Brahma the first cause, the source of the Cosmos, corresponding to God the Father ;...the ব্যাহৃতি means the manifestation of ব্রহ্ম as pervading the Cosmos ভূর্ভুবঃ স্বঃ...and the Gayatri expresses ব্রহ্ম as the light of light in our souls, our inspiration and impulse to all that is good, even unto Salvation,—corresponding to the Holy Ghost."—*Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity* (1899), pp. 85-86.

৫ ঐ. ('ভক্ত'), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪।

৬ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪।

৭ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬ ('দীক্ষার দিন')।

৮ শান্তিনিকেতন, ('কর্ম যোগ'), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।

৯ ঐ. ('বিশ্ববোধ'), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০।

১০ ঐ. ('বিশ্বব্যাপী'), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭।

১১ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° ছিন্নপত্র, পৃ. ২৮৯-৯১ (১৩৬৭ সংস্করণ)।

১২ শান্তিনিকেতন, 'প্রার্থনা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

১৩ দ্র° পরিশেষ : 'প্রণাম'।

১৪ শান্তিনিকেতন ('প্রার্থনা'), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

১৫ দ্র° *Sadhana*, p. 116 ('Realisation in Love').

তু° "…ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী ;
প্রত্যুত্তরে নানাছন্দে গেয়েছে সে 'ভালো বাসিয়াছি'।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার।…"—সেঁজুতি : 'জন্মদিন'।

১৬ দ্র° পরিশেষ : [সংযোজন] : 'লক্ষ্য শূন্য'।

১৭ দ্র° ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৩শ অধ্যায়, ৩য় খণ্ড।

১৮ দ্র° Dr. Sachin Sen M. A., Ph. D. : *The Political Thought of Tagore* (1947), pp. 13-14.

১৯ দ্র° *The Religion of an Artist.*

২০ শান্তিনিকেতন ('বিশ্ববোধ') : ২য় খণ্ড. পৃ. ৪৩।

২১ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সমিতির সশ্রদ্ধ নিবেদন।
বৈশাখ, ১৩৬৮॥

রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্

১. সূচনা

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নিকট লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানাইতেছেন—

"টমসন তাঁহার কেতাবে আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইহাতে কাজ সহজ হয়—রেখার স্পষ্টতা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সেই অতিস্ফুটতাই সত্যের অসম্পূর্ণতা। মানুষের কেবল যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহা নহে, তাহার সম্বন্ধ আছে—সেই সম্বন্ধ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি-নির্দ্দিষ্ট নহে। আমার সেই সম্বন্ধের সত্যটি টমসন দেখিতে পান না। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া দেখিয়াছি যে তিনি ঠিকমত জানেন না যে বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে। তাহার কারণটি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে; সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া ইহা বুঝা যায় না। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল—সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে—সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন, নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না। কিন্তু কবির পক্ষে এ সকল তর্ক যদি ধৃষ্টতা হয়, তবে মাপ করিবেন।"[১]

'শান্তিনিকেতনে'র একটি ভাষণেও মহর্ষির উল্লেখপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা বলিয়াছেন—

"প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনে আনন্দ-প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কিরকম নিবিড় রসবেদনা-পূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।"[২]

মহর্ষির নিকট হইতে পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ অধ্যাত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা সত্য হইলেও, তিনি আপন কবিসুলভ সহজ তত্ত্বদৃষ্টি ও

জীবন-দর্শনের আলোকে উপনিষদের বহু-উচ্চারিত—"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্"—মন্ত্রসমূহের যে নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়েও কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত উপনিষদের সম্বন্ধ এতই সুগভীর ও অবিচ্ছেদ্য, যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে চিন্তা করাই দুরূহ ব্যাপার। উপনিষদের মন্ত্ররাজি রবীন্দ্রনাথের নিকট কতকগুলি তত্ত্বকথার সমষ্টিমাত্র ছিল না, উহা তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মূলে জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের অক্ষয় উৎসরূপে বিরাজমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার সমগ্র জীবনচর্যা সেই দৃষ্টির সহিত অবিরোধ সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত। এই দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনই বর্তমানকালে উপনিষদের এক অভিনব প্রাণবন্ত ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ উপনিষৎকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভাষণাংশটুকু হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে—

"উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি যেমন সকল সংকীর্ণতাকে পরিহার করিয়া চলিত, বিশ্বের বিচিত্র বাণীর মধ্যে যেমন একটি গভীর ঐকতান আবিষ্কারের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, একটি পরম সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের মধ্যে যেমন সর্ববিধ আপাত-বিরোধ ও বৈষম্য নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনুক্ষণ রত থাকিত, উপনিষদের মন্ত্ররাজিতেও অনুরূপ বাণীই ভারতীয় ঋষিগণের উদার কণ্ঠ হইতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

"স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় ব'লে আমার কবিতা প'ড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। . . আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিম দেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।"[৪]

এইভাবে উপনিষদের ভাবধারায় আবাল্য বর্ধিত কবি আপনার মানস ও অধ্যাত্ম-লোকের পরিপুষ্টিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার দৃষ্টিও প্রাচীন ঋষিকবিগণের দৃষ্টির ন্যায়ই স্বচ্ছ, নির্মল, উদার এবং দেশকালবিনির্মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। তাহার উপর ছিল প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্বাধীন বন্ধনহীন ক্রীড়া—বিশেষতঃ, শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে নিরন্তর ঈশ্বরারাধনার পরিবেশের মধ্যে মহাকবি আপনার অধ্যাত্মবোধের উপযুক্ত পরিমণ্ডলই খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণের এক স্থলে কবি বলিতেছেন—

"এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। ··· চার দিকে বিশ্ব-প্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।"[৫]

২. দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে একটি সমন্বয়াত্মক যোগসূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন কালে দৃষ্ট মন্ত্ররাজির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন কতখানি সম্ভব, তাহা সত্যই বিচারসহ কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের চেষ্টার বিরাম নাই। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যানশৈলী হইতেই পরবর্তীকালে বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রস্থানভেদের মধ্যে আচার্য শঙ্করপ্রবর্তিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে এবং ভারতীয় দার্শনিক মনীষার অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভরূপে বিশ্বের বিদগ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই দার্শনিকতার কথা বাদ দিলেও শঙ্করপ্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের প্রভাব ভারতীয় সমাজজীবনের উপর দূরপ্রসারী হইয়াছিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে যে কুফলও প্রসব করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্য শঙ্করের কর্মসন্ন্যাসমার্গ তাঁহার অদ্বৈতবাদের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়া সাধারণ অল্পবুদ্ধি জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও

কর্মসন্ন্যাসমার্গের বিরুদ্ধে যখন দ্বৈতবাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, জন-জীবনেও তাহার প্রভাব লক্ষিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই একান্ত অদ্বৈতবাদ ও একান্ত দ্বৈতবাদ—এই উভয় মতবাদের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস অতি স্বল্প কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত ক'রে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

"সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

"তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

"অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিযার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন, অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

"শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো, সে কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।"*

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে এই পরস্পর দ্বন্দ্ব নিরর্থক। কেননা, তিনি সত্যকে তর্কের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান না, তিনি তাহাকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চান; এবং উপলব্ধির মধ্যে দ্বৈত ও অদ্বৈত পাশাপাশি ভাসমান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়। সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন ক'রে, বিস্মৃত হয়ে, আমরা এক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর-এক দিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

"আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত একঘরে করতে চান।

"যাঁরা 'অদ্বৈতম্' এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে

প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।"[৭]

কিন্তু যদিও রবীন্দ্রনাথ ভেদ ও অভেদ, ঐক্য ও বৈচিত্র্য—উভয়কেই সমান সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, তথাপি অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতও নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 'নির্বিশেষ' শীর্ষক ভাষণে তিনি বলিতেছেন—

"...নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

"অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং, মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্তভাবে যে সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।"[৮]

অদ্বৈত ও দ্বৈত-প্রত্যয়ের এই অন্তহীন দ্বন্দ্ব ও লীলা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দশপদী কবিতাটিতে অনুপম কাব্যরূপ লাভ করিযাছে—

আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। 'আছি' আর 'আছে'
অন্তহীন আদিপ্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর! তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া .
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।[৯]

৩. ব্রহ্মের স্বরূপ : নির্বিশেষ ও সবিশেষ

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, এবং তিনি অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই মন্ত্রটি নিরন্তর ধ্যানের বিষয় ছিল, শুধু ধ্যান নয় প্রাত্যহিক আচরণের নিয়ন্তা ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়। এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

"সেই সাধনাটি কী? আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধাবশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রবীন্দ্রনাথ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্বরূপে দেখেন নাই। ব্রহ্ম এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এই সীমার মধ্য দিয়াই তাঁহার অসীম অনন্তস্বরূপ নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন, সেই পরম সত্যের মধ্যে সকল বিরোধের সমন্বয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এইবার আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

"অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে? তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এই জন্যই সত্য গতিমান। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে সে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন—এইজন্যই মন্ত্রের একপ্রান্তে 'সত্যং', আর-এক প্রান্তে 'অনন্তং ব্রহ্ম', তারই মাঝে মাঝে 'জ্ঞানং'।

"এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে, কিন্তু সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা, সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই; তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিকভাবে কোথাও নেই; তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপ গ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম, সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত; তাঁর মধ্যে

রূপ এবং অরূপ দুইই সংগত হয়েছে।"[১১]

অনন্তের সম্যক্ উপলব্ধি যাঁহার ঘটিয়াছে, তাঁহার কাছে যে সকল দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটিয়া গিয়াছে,—কর্মক্ষেত্রেই হউক, বা দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে হউক, অথবা ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের আলোচনাতেই হউক—এ কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন অপরূপভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনটি আর কেহ পারিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপের এই উপলব্ধি শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশুদ্ধ অনুভূতিমাত্র নহে, এই উপলব্ধি 'সংবেদনঘন আনন্দানুভূতি'—রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন, 'আনন্দের জানা। প্রেমের জানা।' 'সামঞ্জস্য' শীর্ষক ভাষণের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী।…কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই।…

"উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।…তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।…

"আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই ; সে হচ্ছে প্রেমে।…

"কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, তারা বিপরীত পর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই।…

"দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal ? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না এক সঙ্গে মিলে আছে।…সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে ; সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

"ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না।…কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। …প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

"ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন।…তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। তাঁর যে আনন্দ-রূপ যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। কোন্‌টা বড়ো

কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা।···

"তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি।—যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য।···অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।···

"স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি।···অধীনতা জিনিসটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণব ধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে।···"[১২]

যেহেতু প্রেমের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সর্ববিরোধের সামঞ্জস্য এবং যেহেতু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি', 'রসানাং রসতমঃ'—সেই হেতু ব্রহ্ম একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় এবং ক্রিয়াবান্, একই সঙ্গে শান্ত ও চঞ্চল, যুগপৎ কূটস্থ ও সর্বতঃপ্রসারী।

"উপনিষদ বলেছেন—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা', এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন; কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', মহান-আপন-রূপে, পরম-এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতৎ'—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।"[১৩]

আবার—

"উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু—এই তো হল জগৎ। চার দিকে দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে—স্বাভাবিক এই কাজ—অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে—এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে বাহিরের 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এবং

অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।"[১৪]

কিন্তু সেই ব্রহ্ম বা পরমা শক্তির এই সতত পরিস্পন্দ বা ক্রিয়া যেহেতু স্বাভাবিক, বাহিরের কোনও প্রভাবের তাডনায় নয়, সেই হেতু এই ক্রিয়াশীলতা তাঁহার স্বরূপানন্দেরই বিলাস বা লীলামাত্র। সেইজন্যই তিনি স্বাধীন, মুক্ত।

"উপনিষৎ বলেন, তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।"[১৫]

এইভাবে ব্রহ্মের মধ্যে সকল বিরোধের সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই তিনি চরম সত্য, তিনি অখণ্ড এবং তিনি অদ্বৈত। রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভাংশটিতে ব্রহ্মের এই পরম সত্যরূপ অনুপম ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

"সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্যে আর একটা সত্যকে মানতে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তা হলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে শয়তানকে মানতে হয়।

"কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি নে—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। আমরা জানি তিনিই এক ; খণ্ড সত্তার সমস্ত-বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।"[১৬]

৪. ব্রহ্মবাদীর লক্ষণ

এইভাবে ব্রহ্মে 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া'র সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটিয়াছে। সুতরাং যিনি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার জীবনেও অনুরূপভাবেই জ্ঞান কর্ম ও প্রেম বা আনন্দের সমাবেশ ঘটিবে—কেননা, উপনিষদে আছে, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', ব্রহ্মবিৎ যিনি তিনি ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। যদিও সম্পূর্ণ তাদাত্ম্যলাভ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অসম্ভব এবং অনভীপ্সিতও

বটে, তথাপি ব্রহ্মের সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ক্রিয়াশক্তি এবং অনন্ত আনন্দ ও প্রেমের স্বল্প অংশও যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের আধারে সঞ্চিত করিতে পারি, তবে তাহাতেই আমাদের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে।[১৬ক] যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি সেই পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ন্যায়ই জ্ঞানযোগী, নানা কর্মে সতত যুক্ত এবং সর্ববিধ কর্মই তাঁহার নিকট আনন্দের আভাসমাত্র, পরাধীনতার শৃঙ্খল নহে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ', ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কাকে বলেছেন! আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীডা, এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে, অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না। সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কি করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য তিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি 'আত্মরতিঃ', পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ; এবং তিনি 'আত্মক্রীড়ঃ,' তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে—তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিত-সাধন সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে, ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

"ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন—তিনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণানেকান্নিহিতার্থো দধাতি।' তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন।...আমাদেরও সার্থকতা ওইখানে—ওইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে।"[১৭]

যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও অনন্তের প্রকাশ সুস্পষ্ট, তাঁহার প্রত্যেক কর্তব্যকর্মে ব্রহ্মেরই আনন্দাংশ বিমিশ্রিত হইয়া আছে। এইভাবে ব্রহ্ম শুধু তাঁহাব নিকট কেবলমাত্র যুক্তিসিদ্ধ একটি অমূর্ত ভাবমাত্র নহে, উহা তাঁহার

প্রাত্যহিক আচরণের অঙ্গীভূত ও উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে উপনিষদের বাণীসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মের abstract রূপ নিতান্তই অলীক বলিয়া প্রতিভাত হয়—উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণেরও ব্রহ্মের এই জাতীয় রূপ অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত স্পষ্ট—

"য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ, জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তস্বরূপ—অর্থাৎ, এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

"এরকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে, কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।"[১৮]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সংসারত্যাগের, কর্মসন্ন্যাসের কোনও আবশ্যকতা নাই; বরং সন্ন্যাসমার্গ তাঁহার নিকট ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে অন্তরায়। ব্রহ্মবিৎ নিরন্তর কর্মযোগের দ্বারাই আপন যথার্থ সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কর্মসন্ন্যাসের দ্বারা নহে।—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।…

সুতরাং আচার্য শঙ্করের কর্মসন্ন্যাসমার্গের সহিত রবীন্দ্রনাথের কর্মযোগের বিরোধ অতি স্পষ্ট। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই উদ্ধারযোগ্য—

"আমাদের আত্মার যে সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে, এই শান্ত-শিব-অদ্বৈতের দিকে—কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়।…

"এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

"মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করল।[১৯]

"এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি-আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-

ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো—সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।"[২০]

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ"—উপনিষদের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের সকল জীবনসাধনার মূলে ছিল। তাঁহার প্রত্যেক কর্ম আনন্দের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রকৃত ব্রহ্মবাদীর জীবনে তাই জ্ঞানের সহিত কর্মের, কর্মের সহিত আনন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে, সেই আনন্দ-সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন, এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সে মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।"[২১]

ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ রবীন্দ্রনাথের এই জীবন-সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—

The Vedanta system and its latest exponent Rabindranath stand for a synthetic idealism, which while not trying to avoid the temporal and the finite, has still a hold on the Eternal Spirit. They give us a practical mysticism which would have us live and act in the temporal world, but make action a consecration

and life a dedication to God. But our work in the temporal world should not absorb all our energies and make us miss the vision universal. With a strong hold on the idea of the all-pervading, we must work in the world. "Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many" (*Gitanjali*, 63). The truly religious hero does the dullest deeds with a singing soul.[২২]

৫. রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রের আলোকে ব্রহ্মবাদীর যে লক্ষণ অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগে নব্যবঙ্গের দুই মহাপুরুষের চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে চিত্র উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপন-আপন দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে অঙ্কন করিয়াছিলেন, বাঙলার নবযুগের প্রথম প্রবর্তক ভারত-পথিক রামমোহন ও আপন পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই দুই মহান্ নেতার চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল, একমাত্র সেই সমন্বয়ের ফলেই সঙ্কীর্ণ জীবনবোধ দূরীভূত হইয়া উদার বিশ্ববোধের স্ফূর্তি সম্ভব হইতে পারে। ব্রহ্মোপলব্ধির পথ যে কর্মসন্ন্যাস নয়, কর্মযোগ ; সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে মুক্তিলাভ করা যায় না, সংসারের সর্ববিধ কল্যাণকর কর্মে চিন্তায় ও ধ্যানে আপনাকে যুক্ত করিয়া রাখাই যে সর্বোত্তম মুক্তিমার্গ—কোনও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে ; এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই যে মর্ত্যমানবের পক্ষে চরম আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রেয়ঃপথ—ইহা এই দুই মহামানবের জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল সাধনাই যে উপনিষদের উদার বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ—তাহা ধর্মীয়ই হউক, সামাজিকই হউক, অথবা রাষ্ট্রীয়ই হউক,—ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে দেখাইয়াছেন, তেমনটি আর কেহও পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ—

"একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল,...তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয়

বললেই হয়।…তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল…।

"এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না।…

"সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব-সাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

"সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কিরকম প্রবল এবং তাকে আপনার মধ্যে কিরকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।"[২৩]

'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণেও রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

"…এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ ক'রে, বিশ্বব্যাপী ক'রে, প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

"রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্য বাণী ঘোষণা করেছে।…"[২৪]

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন সাধনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়েরই যোগ্য উত্তরসাধক ছিলেন—তাই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যে তাঁহার জীবন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের মতই আপনার সৌন্দর্য ও সৌরভ চতুর্দিকে বিকিরণ করিতে পারিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপঃপূত জীবনের বিচিত্র সাধনার কথা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় সাংসারিক জীবের পক্ষে ব্রহ্মোপলব্ধি কি জাতীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃদেবের আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনোই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না—… কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজী শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন…অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব।"[২৫]

মহর্ষির ব্রহ্মসাধনা যে কর্মসন্ন্যাস নয়, কিন্তু বহু বিচিত্র কর্মধারার সতত নিরাসক্ত অনুসরণ, তাহা 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলীর অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতেও অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"…তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম—নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম; চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই-যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থখানি যে কি জন্য তাঁহার "পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ" করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কেননা, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্ররাজির মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির যে স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের প্রাত্যহিক চিন্তা ও আচরণের মধ্যেও তাহারই প্রকাশ মূর্ত দেখিয়াছিলেন—

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছ্বসিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়—নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত স্পন্দ হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণ ভিত্তির পরে—চৌদিকে আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—
তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্যমাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি—কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।

সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা-'পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।

'নৈবেদ্যে'র এই চতুর্দশপদী কবিতাটি যে শুধু 'নিত্যোঽনিত্যানাম্—', শান্ত শিব অদ্বৈত পরব্রহ্মের নিঃসঙ্গ রূপটিই প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, সংসারে সহস্র কর্মবন্ধনে জড়িত হইয়াও যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ অন্তরের গভীর অন্তঃপুরে নিঃসঙ্গ একাকী ভাবে বিরাজ করিতেন—'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'—সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইহা যথাযথ চিত্রও বটে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে একটি ভাষণে বলিয়াছিলেন—

"তার পর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যুষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যুষের আবছায়া অন্ধকারে পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই ক'দিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যসত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন আমার যুবক বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, সংসারের খাতা, জমিদারির

খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট ক'রে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

"আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য—স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন।"[২৭]

'নৈবেদ্যে'র চতুর্দ্দশপদীটির সহিত এই অনুচ্ছেদটিকে মিলাইয়া পড়িলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, রবীন্দ্রনাথের উপাস্য 'সঙ্গবিহীন দেব' শুধুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়-ভূত অথচ নিঃসঙ্গ পরমাত্মতত্ত্বই নহেন, তাঁহার ইহজীবনের প্রত্যক্ষ আরাধ্য দেবতা পিতৃদেবও বটেন।[২৮]

৬. উপনিষৎ ও ব্রাহ্মসমাজ

রবীন্দ্রনাথ যদিও ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা সংকীর্ণচিত্ততা তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্মকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মেরই একটি উপাশাখারূপে কল্পনা করেন নাই[২৯]—তিনি ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে ভারতের চিরন্তন উদার চিন্তার উৎস অভিমুখে জনগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার একটি অভিনব আয়োজন রূপে দেখিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণে তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বর্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে—এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে ফুটে উঠছে।

"ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ ক'রে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।"[৩০]

ব্রহ্মোপাসনা যে শুধুই ঈশ্বরারাধনা এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান ও আচারপদ্ধতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নহে, সর্ববিধ কুসংস্কার,—ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধি ও বিরোধের

অপসারণের দ্বারা একটি উদার সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষসাধনের দ্বারাই যে ব্রহ্মোপাসনার অন্তর্নিহিত সত্যকে আমরা স্বকীয় আচরণের সাহায্যে ইহজীবনে প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারি, এবং তাহাই যে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং এখনও হওয়া উচিত, তাহা রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক আচার্যবৃন্দ উপনিষদের যে বাণী-সমূহকে আপন-আপন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ও আলম্বনরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, সে-সকলের মধ্যে ভেদ ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করিয়া, একটি অদ্বিতীয় পরমার্থ তত্ত্বের মধ্যে উহাদিগকে মিলাইয়া দেখিবার সাধনা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই সাধনাই ভারতের চিরন্তন সাধনা—ইহাই 'ব্রহ্মসাধনা'। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্য-সাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।"[৩১]

এই চিরন্তন ব্রহ্মসাধনার ধারা ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনও কোনও পর্বে আবিল হইয়া উঠিয়াছে, কখনও বা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ ঐক্য স্থাপন করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে, আবার কখনও ঐক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিরোধ ও বৈষম্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা ভারতের সত্যসাধনা অবমানিত হইয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত সামাজিক এবং জাতীয় জীবন সংকীর্ণতার দ্বারা কলুষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল সঙ্কট মুহূর্তে ভারতের সাধকগণের কণ্ঠে যাহা চিরন্তন সত্যসাধনা—সেই ব্রহ্মসাধনার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রবর্তকগণও ভারতীয় ঋষিগণের কণ্ঠনিঃসৃত উদার সত্যবাণীর ভিত্তিতে জগৎ ও জীবনের খণ্ড সত্যসমূহকে একটি চরম পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে সমন্বিত করিয়া দেখিবার সাধনার পথ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। য়ুরোপেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস যুগে যুগে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের ব্রহ্মসাধনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের এই দুই বিপরীতমুখী সাধনার পার্থক্য নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"কিন্তু, এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ বা বলে স্বাজাত্য, কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ

বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে।···কিন্তু, এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারে না।··· যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।”[৩২]

ব্রাহ্মসমাজের যিনি আদিপ্রবর্তক, রাজা রামমোহন রায়, তিনি তাই কোনও রাজনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ব্রতী হন নাই। তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন সেই চিরন্তন ‘ব্রহ্মসাধনা’র সুদৃঢ় শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর, যাহা চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন।

“মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল—তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃষ্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পংক্তিতে ভারতের মহা-অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

···তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেন না তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্যদিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।”[৩৩]

কিন্তু ব্রহ্মসাধনার এই জীবন্ত আদর্শ, উপনিষদের ঋষিগণের বাণীর মধ্যে যাহা বিধৃত, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়া রাজা রামমোহন রায় যাহাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী ইতিহাসে রক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে যেমন একটি নিয়ত বিবর্তনশীল তত্ত্বরূপে দেখিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম-সমাজও সেই মানবের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মতত্ত্বের মতই নিয়ত চলমান হইবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কামনা। সুতরাং ব্রাহ্ম-আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন, যাহা মানব-মনকে সর্ববিধ জড়তা ও বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, যাহার মূল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অভীপ্সা ও শক্তির চিরন্তন উৎস উপনিষদের ভূমির মধ্যে নিহিত, এবং যাহা ভবিষ্যতের অন্তহীন লক্ষ্যের দিকে আপন অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির সতত উল্লাসের সাহায্যে প্রসারিত—ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের স্বরূপ ও ভূমিকা; এবং যেহেতু ইহা কোনও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, সেইজন্য ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংকটের মুহূর্তে—এবং আধ্যাত্মিক সংকটই সামাজিক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্ববিধ অশুভ সম্ভাবনার উৎপত্তিস্থল,—উপনিষদের এই ব্রহ্মসাধনার আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ভারতবর্ষ আপনার মুক্তির সন্ধান পাইবে, যে-মুক্তি কর্মসন্ন্যাসের দ্বারা লভ্য নয়, যাহা একমাত্র জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সুসমঞ্জস সমন্বয়ের দ্বারাই লভ্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট এই উপলব্ধি এতই সত্য ছিল, অসন্দিগ্ধ ছিল যে, তিনি কুণ্ঠাহীন চিত্তে বলিতে পারিয়াছিলেন—

"ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু, চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।"[৩৪]

তাই 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণের অন্তিম অনুচ্ছেদটিতে ঋষিকবির কণ্ঠ হইতে যে সতর্কবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেমন কবির আধ্যাত্মিক বোধ অনুপম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণার সহিত ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তার একটি অপূর্ব সমন্বয়ও উহাতে লক্ষ্য করিবার মত—

"যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই

ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনও দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয় নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চির-প্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি—কিন্তু, তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালীর সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত সেই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক-প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে গম্ভীরমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্য-পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।"[৩৫]

৭. রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববোধ

উপনিষদের ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতি স্তরে এমনভাবে প্রবাহিত ছিল যে, তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা ও কর্ম সেই ঔপনিষদ অধ্যাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, ভাষণে যাহা কিছু লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, সে-সকলই উপনিষদের মূল আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহার বিচিত্র কর্মজীবনের প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে—তাহা সমাজ-উন্নয়নমূলক হউক, শিক্ষা-সংস্কার-বিষয়ক হউক, অথবা রাজনৈতিকই হউক—সেই প্রাচীন আর্ষ আদর্শই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যে-সকল মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু' ইত্যাদি মন্ত্র, তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ' মন্ত্র, ঈশাবাস্যোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' এবং 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ' মন্ত্রদ্বয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপোপাখ্যানের অন্তর্গত সেই প্রসিদ্ধ গাথাপঞ্চক

যাহাতে অগ্রগতির আহ্বান অনুপমভঙ্গীতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, এবং সর্বশেষে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত মৈত্রেয়ীর সেই ব্যাকুল প্রার্থনা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্'—এই বেদবচনগুলি শুধুই যে রবীন্দ্রনাথের মননের বিষয় ছিল, তাহা নহে। প্রত্যহ যেমন এই সকল বেদবচন তাঁহার শ্রবণপথে অমৃতধারা বর্ষণ করিত, সেইরূপ ইহাদের অন্তর্নিহিত উপদেশের সাহায্যে তিনি আপন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সতত যত্নশীল ছিলেন। উপনিষদে বলা হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি স্বয়ং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ বাগাম্ভৃণীয় সূক্তে যেমন অম্ভৃণ-ঋষির কন্যা বাক্ বিশ্বের নিধানভূত শব্দব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ',

বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির সর্বত্র যেমন তিনি আপন সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথও আপন সত্তাকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই, তিনি এই বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র, তরু-লতা, পশু-পক্ষী, আকাশ-জল-মৃত্তিকা, সর্বত্র, আপনার অপরিমিত শাশ্বত সত্তাকে প্রসারিত দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন—

তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।

যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি—
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে ॥[৩৬]

'উৎসর্গে'র এই কবিতাটির মধ্যে কি আমরা প্রাচীন ঋষিগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্র—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি না? 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বর্ষশেষ' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত স্তবকত্রয়ে মহাকবির ঋষিসুলভ বিশ্ববোধ, যাহা ব্রহ্মসাধনার চরম পরিণতি, কী অপরূপ আবেগ ও গভীরতার সহিতই না প্রকাশিত হইয়াছে!

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে-যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা ॥

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

ইহাকে কবির অহঙ্কৃত আত্মশ্লাঘা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহা সেই অর্থে 'আত্মস্তুতি' যে-অর্থে বেদের আধ্যাত্মিক মন্ত্রসমূহকে আরাধ্য দেবতার সহিত তাদ্‌ভাব্যাপন্ন ঋষির আত্মস্তুতি বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কেননা, এই বাণীর মধ্যে যে আত্মস্বরূপের স্ফূর্তি, তাহা পরিচ্ছিন্ন জীবের আত্মা নহে, তাহা সেই পরম আত্মতত্ত্ব যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', যিনি নিত্য, যিনি সর্বগত, যিনি সর্বাত্মভূ।

উপনিষদের অধ্যাত্মবোধের ভিত্তি হইতে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যেও আমরা আর কোনও অসামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইব না। কেন না, রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক হইয়াও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের পরম বিরোধী। তাঁহার আন্তরিক কামনা যে, ভারতবর্ষ আপনার বৈশিষ্ট্য হইতে যেন বিচ্যুত না হয়, ভারতবর্ষের নিজস্ব বাণী যেন কখনও স্তব্ধ হইয়া না যায়, অথচ বিশ্বের ঐকতান সংগীতের বিচিত্র মূর্চ্ছনা শ্রবণের জন্যও তাঁহার চিত্ত সতত ব্যাকুল। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের নির্বিরোধ সহাবস্থান উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাহারই প্রতিবিম্ব সংঘটিত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত বাসনা। কেননা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যথার্থ দেশাত্মবোধের সহিত বিশ্ববোধের কোনও বিরোধই নাই—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিসসম হিমাচল
তব বরাভয় কর,

সাগর তোমার পরশি চরণ,
পদধূলি সদা করিছে হরণ.
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
    দুলিছে বক্ষ-'পর
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
    হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
    মোর সনাতন স্বদেশে।[৩৭]

এই বিশ্ববোধ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় ছিল বলিয়াই তিনি যেমন স্বদেশের নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধের সমালোচনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, সেইরূপ শক্তি-মদ-মত্ত পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দের ন্যাশনালিজ্ম্ বা জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপবাণ ও অভিশাপবাণী বর্ষণ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমেরিকার জনসভায় প্রদত্ত এক ভাষণে কবি তাই বলিয়াছিলেন—

India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them that a country is greater than the ideals of humanity.[৩৮]

"There is only one history—the history of man. All national histories are merely chapters in the larger one."[৩৯]—ইহা কোনও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার বাণী নয়। ইহা সেই কবির বাণী যিনি ঋষিগণের মতই ত্রিকালদর্শী, এবং যাঁহার প্রতিভার অম্লানদর্পণে উপনিষদের অধ্যাত্মচিন্তা স্বমহিমায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী ভাষণে বলিয়াছেন—

My religion is essentially a poet's religion. Its touch comes

to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other, and though their betrothal had a long period of ceremony, it was kept secret from me.[৪০]

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি যে মূলতঃ আধ্যাত্মিক, ইহা তাঁহার রচনাবলী যাঁহারা নিপুণভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নিঃসংশয়ভাবে প্রতীয়মান। তবে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের আধ্যাত্মিক চিন্তার সহিত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। অধ্যাত্মতত্ত্বের যাঁহারা ব্যাখ্যাতা, তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবনারাজিকে একটি সংহত, সুসমঞ্জস যুক্তিসিদ্ধ-রূপে জিজ্ঞাসুগণের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপন করিবার জন্য সতত যত্নশীল। যে-সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে মননের দ্বারা পরিশোধিত করিয়া হেতুবিদ্যার প্রচলিত বিচারপদ্ধতির সাহায্যে অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি অসম্ভব প্রভৃতি যাবতীয় যুক্তিদোষ পরিহারপূর্বক কতকগুলি সিদ্ধান্তের আকারে পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কবি, সেইহেতু বিরোধ বা অসামঞ্জস্য পরিহার করিবার দিকে তাঁহার ততখানি আগ্রহ নাই। কেননা, যে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবচিত্তকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সর্ববিধ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উদ্ভব ও আবর্তন, তাহার মধ্যে বিরোধের, বৈষম্যের, অসামঞ্জস্যের অন্ত নাই। 'শান্তিনিকেতনে'র একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির; একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের; বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি; একই সময়ে এক দিকে তার কর্ম, আর-এক দিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।"[৪১]

এই যে চেতন ও জড়—উভয় কোটি লইয়া অখণ্ড প্রকৃতি নিয়ত লীলা করিয়া চলিতেছে, কবি ও সাধক রবীন্দ্রনাথ ইহার সৌন্দর্য ও মহিমায় মুগ্ধ ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনার সহিত কাব্যসাধনার নিবিড় একাত্মতা অপরূপ বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে—

শুধায়ো না মোরে তুমি, মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই।
আমি তো সাধক নই,

আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি।
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ ক্ষতি কান্নাহাসি—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া ;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা উঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো ;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র ; অস্তসূর্য রক্তিম-উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায় ; সে-তরঙ্গে মাধবী মঞ্জরী
ভাসায় মাধুরী ডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গ নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহিনা রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার দিব্য প্রাতিভ-দর্শনের (Intuition) ফলে কাব্যসত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই জগৎ ও জীবনের পরমস্বরূপও তাঁহার নিকট প্রাতিভ-দর্শনের মধ্যেই ধরা দিয়াছিল—শুধু মননের মধ্যে নয়। উপনিষদের মন্ত্ররাজিও ঋষিগণের প্রত্যক্ষ দর্শনসঞ্জাত সত্য উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশমাত্র।[৪৩] তাই তাঁহারা অবিকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠেও সেই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।[৪৪]

বিশ্বের নিধানভূত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করিবার জন্য কবিচিত্তের কী ব্যাকুলতাই না নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিতে প্রকাশ পাইয়াছে!

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজি ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহজ গানে
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে—
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলি ধূসর প্রহরে
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ—
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি সকল দুরাশা—
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'[৪৫]

প্রাচীন ঋষিগণের সহিত এই প্রতিভা-সঞ্জাত সুগভীর সাজাত্যবশতই রবীন্দ্রনাথের নিকট উপনিষদের বাণীসমূহ এতখানি প্রিয় ছিল, সেগুলি তাঁহার জীবনের পরম সম্পদ্‌রূপে গণিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-পরিবারে, বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তানরূপে, জন্মগ্রহণ কবিচিত্তের এই আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু, কবি-প্রকৃতির সহজাত গঠনের দিক দিয়া বিচার করিলে, উহা একটি আকস্মিক, বহিরঙ্গ, কাকতালীয় ঘটনামাত্র।

বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ দর্শনের (intuition) মধ্য দিয়াই পরম সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন; এবং যেহেতু তিনি কবি ছিলেন, সেইহেতু সেই স্বোপলব্ধ পরম সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার কবিচিত্তের নিরন্তর আকুতি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই প্রকাশও তাঁহার কবিতারাজির মতই প্রজ্ঞার বাণীতেই রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে, মননের যুক্তি-তর্কপ্রধান বিশ্লেষণী ভাষার মাধ্যমে নয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকারোক্তিই উদ্ধারযোগ্য—

I have already confessed that my religion is a poet's religion; all that I feel about it is from vision and not from knowledge. I frankly say that I cannot satisfactorily answer questions about the problem of evil, or about what happens after death. And yet I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy. It has been said in our Upanishads that our mind and our words come away baffled from the supreme Truth, but he who knows That, through the immediate joy of his own soul, is saved from all doubts and fears.[৪৬]

সুতরাং শাস্ত্রীয় বিচারশৈলী প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবনারাজিকে বিশ্লেষণ করিতে বসিলে, তাহাদের মধ্যে অনেক আপাত-বিরোধ, যুক্তির দুর্বলতা ও অস্পষ্টতা সহজেই ধরা পড়িবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-সম্বন্ধে সবিশেষ জাগরূক ছিলেন। কিন্তু উপলব্ধিরও একটি অতি সূক্ষ্ম ও গভীর যুক্তিপদ্ধতি আছে, তাহা লৌকিক মননের বা বিচারপদ্ধতির স্থূল, সহজ-গ্রাহ্য যুক্তি হইতে কোনও অংশেই দুর্বল নহে। উপনিষদের মন্ত্ররাজির মধ্যেও কি লৌকিক

দৃষ্টিতে আপাত-বিরোধ নাই? এবং সেই বিরোধ অপসারণপূর্বক তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনই কি ভগবৎপাদ মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্ররচনার উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু সেই সমন্বয়ের প্রয়াস কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা আমরা ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্ব প্রমুখ ভাষ্যকারগণের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই কিছুটা বুঝিতে পারি। এই প্রসঙ্গে একজন সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"...The Upanisads are nothing but free and bold attempts to find out the truth without the slightest idea of a system; and to say that any one particular doctrine is taught in the Upanisads is unjustifiable in the face of the fact that in one and the same section of an Upanisad, we find passages one following the other, which are quite opposed in their purport. Bold realism. pantheism theism,materialism are all scattered about here and there,and the chronological order of the Upanisads has not been sufficiently established on independent grounds, so as to justify us in claiming that one particular view predominating in a certain number of Upanisads (granting that this is possible) represents the teaching of the Upanisads. And to say that idealism represents the real teaching of the Upanisads because it is contained in a certain Upanisad which is relatively old and that the Upanisad is relatively old beause it contains a view of things with which philosophy should commence, is nothing but a logical seesaw It may be true that if one insists on drawing a system from the Upanisads, replete as they are with contradictions and divergences, Samkara has succeeded the best, because his distinction of esoteric and exoteric doctrines like a sword with two edges can easily reconcile all opposites such as unity and plurality, assertion of attributes and their negation, in conection with one and the same being; but this is one thing and to say that the Upanisads taught Samkara's doctrine is quite another thing[৪৭]

রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের বাণীসমূহকে শাস্ত্রকারগণের বিচারশৈলীর অনুকরণে একটি নির্দিষ্ট প্রস্থান বা system-এর অনুগামী করিয়া সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার কোনও সচেতন প্রয়াস করেন নাই—কেননা, ইহা তাঁহার সহজাত কবিস্বভাবের বিরোধী ছিল। কিন্তু সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-ব্যাখ্যানগুলিকে উপহাস করিবার কোনও হেতু নাই। তিনি তাঁহার কবিসুলভ উপলব্ধির সাহায্যে আর্ষ উপলব্ধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অধ্যাত্মরসপিপাসু জনসাধারণের নিকট সহজগ্রাহ্যরূপে উহাদের তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছেন, যাহাতে পাঠকসমাজও সেই আর্ষ উপলব্ধির অতি সামান্য অংশও আপন-আপন হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া ধন্য হইতে পারে। তিনি নিজেও যেমন উপনিষদের ঋষিবাণীগুলিকে মননের সামগ্রী বলিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, সেগুলিকে যেমন স্বকীয় জীবনচর্যার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছিলেন, সেই বিশ্বসত্তা, বিশ্বরসসরোবর, ও বিশ্বচৈতন্যের দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদন যেমন তিনি সকল ইন্দ্রিয় ভরিয়া লাভ করিবার সাধনায় সতত উৎকণ্ঠিত ছিলেন—

এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে—
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায়।···
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ

ইহাই যেমন ছিল কবিচিত্তের আজন্ম অভীপ্সা, ভারত ও বিশ্বের অধিবাসী সকলেই সেই পরম অমৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া আপনার 'হৃদয় মন দেহ' সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক, এই উদ্দেশ্যেই তিনি উপনিষদের বাণীসমূহের অভিনব ব্যাখ্যানে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে উপনিষদের শিক্ষা বৈরাগ্যের শিক্ষা নয়, সন্ন্যাসের শিক্ষা নয়, কর্মত্যাগের শিক্ষা নয়, জীবনকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত করিবার শিক্ষা নয়; উপনিষদের শিক্ষা পরিপূর্ণ মানবতার উদ্‌বোধন-ব্রতে দীক্ষিত হইবার শিক্ষা, বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্যকে অঙ্গীকার করিবার শিক্ষা, এবং আমাদের প্রাত্যহিক আচরণ ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে-সকল খণ্ড সত্য, তাহারই মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য ও পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই চিরন্তন প্রকাশকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমরা আমাদের জীবনে

গ্রহণ করিতে পারি, তবে পারলৌকিক মুক্তি সাধিত হইবে কি না হইবে সে-বিষয়ে হয়ত সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে ; কিন্তু, আমাদের এই জন্ম-মৃত্যুর উভয় সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীবন যে জ্ঞান কর্ম ও প্রেমে বিকশিত হইয়া এই দুঃখ-শোক-জরা-ব্যাধি-সমাকীর্ণ মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোকের আভাস—তাহা যতই ক্ষীণ হউক না কেন—আনিয়া দিতে সহায়ক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? সাধক রবীন্দ্রনাথের যেমন ইহাই নিরন্তর আকূতি, কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সকল প্রেরণাও কি সেই একই লক্ষ্যের অভিমুখে উৎসারিত হইয়া উঠে নাই ? কেননা, আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাব্যসাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনা একই উৎসের দুইটি সমান্তরাল শাখা মাত্র—উহাদের মধ্যে আত্যন্তিক কোনও বিচ্ছেদ বা বিরোধ নাই। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির যে অংশই আমরা আলোচনা করি না কেন, সর্বত্রই সেই 'বিশ্বরস-সরোবরে'র আনন্দ-কণিকার আস্বাদন লাভ করিয়া আমরা ধন্য হই, খণ্ড সত্তার মধ্যেই অখণ্ড বিশ্বসত্তার স্ফূর্তি প্রত্যক্ষ করি। তাঁহার কর্মজীবনেও সেই একই অখণ্ডের সুর ধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সকল কর্ম, সকল নর্ম, সকল সাধনার ভিতর দিয়া উপনিষদের 'অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত উদার স্রোতস্বতী'কে প্রত্যেক বিশ্ববাসীর হৃদয়দ্বারে প্রবাহিত করিয়া দিবার ব্রতে আপনাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আমরা যেন সেই মন্দাকিনী-স্রোতে অবগাহন করিয়া ধন্য হইতে পারি, তাহাকে যেন বিদ্রূপ করিয়া উপহাসভরে অবজ্ঞা না করি। কেননা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাধক-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এই ভাগীরথীপ্রবাহকে বর্তমান যুগের মানবমনের ঊষর ভূমিতে আবাহন করিয়াছিলেন। আপন অধ্যাত্মসাধনার বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়া তিনি নব ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই।[৪৮]

১ দ্র° বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮৮০ শক।

২ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩, 'সামঞ্জস্য'। বিশ্বভারতী হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধসংকলন আলোচ্য।

৩ শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০, 'প্রার্থনা'।

৪ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১, ৩৯৪ 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান'।

৫ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২, 'ভক্ত'।

৬ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪-৫৫, 'জগতে মুক্তি'।

৭ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩, 'মত'।

৮ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮, 'নির্বিশেষ'।

৯ উৎসর্গ ২২।

১০ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫, 'একটি মন্ত্র'।

১১ ঐ. পৃ. ৩৭৩-৩৭৪, 'একটি মন্ত্র'।

১২ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩৫, 'সামঞ্জস্য'।

১৩ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯, 'আত্মবোধ'।

১৪ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০, 'একটি মন্ত্র'। তু° ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৮, 'স্বাভাবিকী ক্রিয়া'।

১৫ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪, 'কর্মযোগ'। তু°—'প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে, আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।"—ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫, 'কর্ম'।

১৬ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬, 'প্রেম'।

১৬ক তু° "Yes, we must become Brahma. We must not shrink from avowing this···But can it then be said that there is no difference between Brahma and our individual soul? Of course the difference is obvious ···Brahma is Brahma, he is the infinite ideal of perfection. But we are not what we truly are; we are ever to become true, ever to become Brahma. There is the eternal play of love in the relation between this being and the becoming; and in the depth of this mystery is the source of all truth and beauty that sustains the endless march of creation."—*Sadhana*: 'The Realisation of the Infinite', p. 155. দ্র° শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮৪, 'হওয়া'।

১৭ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৩, 'কর্মযোগ'।

১৮ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭, 'বিশ্ববোধ'। তু°—"We have often heard the Indian mind described by Western critics as metaphysical, because it is ready to soar in the infinite. But it has to be noted that the infinite is not a mere matter of philosophical speculation to India; it is as real to her as the sunlight. She must see it, feel it, make use of it in her life. . ." —*Lectures & Addresses*: 'What is Art?', p. 92.

১৯ তু° "To the Buddhist, this world is transitory, vile and miserable; the flesh is a burden, desire an evil, personality a prison."—Laurence Binyon: *Painting in the Far East*, p. 22.

২০ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৪, 'সামঞ্জস্য'। আচার্য শঙ্করের মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতবাদের এই বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াই ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ মন্তব্য করিয়াছেন—"Between the stern philosophy of Sankara, with its rigorous logic and the ascetic

ethic of inaction and the human philosophy of Rabindranath Tagore, it is war to the knife."—*The Philosophy of Rabindranath Tagore*, p. 114. (Macmillan & Co. Ltd. 1918).

২১ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭, 'চিরনবীনতা'।

২২ *The Philosophy of Rabindranath Tagore*, p. 83.

২৩ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৩৯, 'সামঞ্জস্য'।

২৪ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪।

২৫ চারিত্রপূজা, পৃ. ৮৭-৮৮।

২৬ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪, 'সামঞ্জস্য'।

২৭ চারিত্রপূজা, পৃ. ১০১।

২৮ তু° "The writer has been brought up in a family where texts of the Upanishads are used in daily worship; and he has had before him the example of his father, who lived his long life in the closest communion with God, while not neglecting his duties to the world, or allowing his keen interest in all human affairs to suffer any abatement."—*Sadhana*: Preface, p. vii.

২৯ দ্র° "মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে প্রচার করতে উৎসুক ছিলেন। সেই-জন্য মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে হিন্দুসমাজের রীতি রক্ষা করে তাঁর সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করেন। কিন্তু রবি-কাকা সেরকম কোনো পূর্বসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর পারিবারিক জীবনেই তার প্রমাণ দিয়েছেন।…"—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী: রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ. ৬১। তু° চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৩ [পত্রসংখ্যা ১০]।

৩০ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০-২১

৩১ ঐ. ২য় খণ্ড. পৃ. ২২১, 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'।

৩২ ঐ ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৬, ঐ।

৩৩ দ্র° ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃ. ২২ (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ)।

৩৪ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮, 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'।

৩৫ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৭, ঐ।

৩৬ উৎসর্গ ১৪। দ্র° ছিন্নপত্র, সংযোজন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিকট লিখিত কবির পত্র।

৩৭ উৎসর্গ ১৬।

৩৮ দ্র° Nationalism in India: *Lectures & Addresses* by Rabindranath Tagore (Selected by Anthony X. Soares, M. A., LL.B.). Macmillan & Co. Ltd. 1955, p. 105.

৩৯ ঐ পৃ. ১০২।

৪০ *The Religion of an Artist*, p. 10 (Visva Bharati).

৪১ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯, 'শ্রাবণসন্ধ্যা'।

৪২ পরিশেষ, 'পান্থ'।

৪৩ তু° 'দর্শনাদৃষয়ো বভূবুঃ।'

৪৪ পরিশেষ, 'বর্ষশেষ'।

৪৫ ঐ, 'জন্মদিন'।

৪৬ *The Religion of an Artist*, p. 12.

৪৭ দ্র° V. S. Ghate: *The Vedanta*: A Study of the Brahma-Sutras with the Bhasyas of Samkara, Ramanuja, Nimbarka, Madhva and Vallabha. Second Edition, 1960 (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona). Introduction, p. 9. অপিচ তুলনীয়: "And life is not dogmatic; in it opposing forces are reconciled—ideas of non-dualism and dualism, the infinite and the finite, do not exclude each other. Moreover the Upanisads do not represent the spiritual experience of any one great individual, but of a great age of enlightenment which has a complex and collective manifestation, like that of the starry world. Different creeds may find their sustenance from them, but can never set sectarian boundaries round them; generations of men in our country, no mere students of philosophy, but seekers of life's fulfilment, may make living use of the texts, but can never exhaust them of their freshness of meaning"—Rabindranath; . *Foreword* to S. Radhakrishnan's *The Philosophy of the Upanisads.*

৪৮ এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সারগর্ভ মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

"The ancient wisdom of India held renunciation to be only a factor and not the end in itself. The balanced harmony between the great affirmation and the great renunciation is emphasised by the humanist thinkers of the country. Rabindranath Tagore is the representative of the humanist school. The impression that Rabindranath's views are different from those of Hinduism is due to the fact that Hinduism is identified with a particular aspect of it—Samkara Vedanta, which, on account of historical accidents, turned out a world-negating doctrine. Rabindranath's religion is identical with the ancient wisdom of the Upanishads, the Bhagavadgita, and the theistic systems of a later day.

"Our conclusion is that in his *Sadhana* and other works,

Rabindranath by his power of imagination has breathed life into the dry bones of ancient philosophy of India and made it live. His teaching is in no sense a mere borrowed product of Christianity; indeed, it goes deeper in certain fundamental aspects than Christianity, as represented to us in the West. And if Rabindranath's religion is something "better than the Christianity which came into it", it only shows that the ancient religion of India has not much to gain from Western Christianity."—*The Philosophy of Rabindranath Tagore*, p. 119.

'অভিসার' কবিতার উৎস-সন্ধানে

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায় এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল।......আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে এ সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায়নি।"—রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা'

১৮৮২ খৃস্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উপর এই গ্রন্থখানির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটি সম্পূর্ণ নূতন জগৎ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। প্রাচীন ভারতের এক নবতম রূপ তরুণ কবিকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি এই গ্রন্থখানির মধ্যে অসংখ্য কবিতা ও নাটকের উপাদান খুঁজিয়া পাইলেন। বঙ্গসাহিত্যও কবির লেখনীপ্রসূত নব নব কাব্য-সম্পদে বিভূষিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লিখিত গ্রন্থের সাহায্যেই উত্তরভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম ও সাহিত্যের লুপ্তস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। নেপালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সকল পুঁথি রক্ষিত ছিল, সেইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই যদিও এই গ্রন্থের প্রধান রচয়িতা ছিলেন তথাপি স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ও তাঁহাকে সম্পাদনকার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া-ছিলেন। বহু গ্রন্থের পরিচয় শাস্ত্রীমহাশয়েরই রচনা।[১]

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলির রচনাকাল—কার্তিক ১৩০৪ - অগ্রহায়ণ ১৩০৬ (খৃস্টীয় ১৮৯৭-৯৯ সাল)। সুতরাং প্রত্যক্ষতঃ 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলির মূল উৎস যে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থই, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকিতে পারে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের পুঁথিগুলির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে বৌদ্ধ আখ্যানগুলির মাধুর্য সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, এমন কি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের মত সাহিত্যরসিক মনীষীও প্রসিদ্ধ 'অবদানশতক' গ্রন্থের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন : "The stories are puerile and of little interest."[২] কিন্তু এই সকল অতি সাধারণ আখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব কবিতারাজি সৃষ্টি

করিয়াছেন। 'দশরূপক' প্রণেতা আচার্য ধনঞ্জয় সত্যই বলিয়াছেন—

রম্যং জুগুপ্সিতমুদারমথাপি নীচ-
মুগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
যদ্বাঽপ্যবস্তু কবিভাবকভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লোকে॥

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ঐসকল অতিসাধারণ, এমন কি অনেকস্থলে জুগুপ্সাব্যঞ্জক, কাহিনীকে অপূর্ব কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ইহা যে শুধুই অলস, নিষ্প্রয়োজন ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির উপায়মাত্র, তাহা নহে; রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও বহুলপরিমাণে এইজাতীয় তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যেই হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয়।

২

'কথা' কাব্যের 'অভিসার' কবিতাটির[৩] মূল 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' বলিয়া কবি নির্দেশ করিয়াছেন। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থের রচয়িতা কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস। রচনাকাল খৃস্টীয় ১১শ শতকের মধ্যভাগ।[৪] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই সুবিস্তৃত কাব্যখানির বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়।[৫] স্বয়ং রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই অংশের রচয়িতা। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র দ্বিসপ্ততিতম অবদানে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সেই অংশের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Upagupta was intended by his father, Gupta of Mathura, to be a disciple of Sonavasi. Upagupta had deep reverence for Sonavasi. Vasavadatta, a prostitute, finding Upagupta very handsome, desired him to call at hers. Upagupta said, "This is not the proper time for going to a prostitute; I shall call at the proper time." Some time after this, Vasavadatta poisoned one of her paramours at the instigation of another. She was sentenced to be killed with torture. The executioner cut her nose, her ears, her hair, and took away her clothes. Upagupta, thinking that to be a proper time for seeing a prostitute, appeared before Vasavdatta, and instructed her in his faith, which gave her

great consolation. Upagupta became an Arhat; he conquered Kama and commanded him to exhibit Sugata's beauty. Kama transformed himself into Sugata, assuming a brillant form with large eyes shut in meditation, and still eye-brows. Upagupta converted eighteen lacs of the people of Mathura."[৬]

৩

'উপগুপ্ত-অবদানে'র এই অস্থি-কঙ্কাল অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ইন্দ্রজাল সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের মূল সংস্কৃত গ্রন্থেও উদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে অধিকতর মাধুর্য নাই।[৭] মূলে বাসবদত্তার চরিত্র নিরতিশয় ঘৃণ্য, সে মথুরানগরীর প্রধানা রূপাজীবা মাত্র—গন্ধবিক্রয়ী গুপ্তপুত্র উপগুপ্তের দেহসৌন্দর্যে সে বিমোহিত হইয়াছে। বিশ্বস্ত দূতীকে উপগুপ্ত সকাশে পাঠাইয়া সে আপনার অন্তরের প্রণয় নিবেদন করিয়াছে—

সঞ্জাতরাগসংবেগা গণিকা সংগমার্থিনী।
বিসৃজ্যাভিমতাং দূতীং ভাবং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।—বোধি. ৭২. ৭

কিন্তু গুপ্তপুত্র স্মিতমধুর ভাষণে তাহার সেই প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—

স স্বৈরমর্থিতো দূত্যা সস্মিতস্তামভাষত।
অয়ং নাভিমতঃ কালস্তস্যাঃ সন্দর্শনে মম ॥—ঐ. ৭২. ৮

উপগুপ্তের প্রতি গণিকা বাসবদত্তার প্রণয় অনেকটা বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার অনুরাগেরই অনুরূপ। উভয়েই কামপ্রবৃত্তি ও গণিকাসুলভ অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নিরীহ পূর্ব প্রেমিককে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নাস্মাকমেতদ্ বাণিজ্যং ত্যজ্যতে যদি বিত্তবান্।
ন ধর্মায় ন কামায় বয়মর্থায় নির্মিতাঃ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা মাতুঃ সংমতে দ্রবিণার্থিনী।
বরাসবেন ন্যবধীৎ সবিষেণ বণিক্সুতম্ ॥—ঐ. ৭২. ১৬-১৭

শেষ পর্যন্ত নিজের এই দুষ্কৃতির উপযুক্ত নিগ্রহও তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। মুক্তকেশী মুক্তবসনা হইয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে যাইতে হইয়াছে; হস্তপাদ, কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিয়া তাহার অতীতের রূপসৌভাগ্যগর্ব রাজপুরুষগণ হরণ করিয়াছে—শোণিতক্লিন্নভূমিতে শয্যা বিছাইয়া তাহাকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে— যে মথুরাবাসী নাগরিকবৃন্দ একদা মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তাহার অপরূপ

দেহসুষমাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার চতুর্দিকে বিচরণ করিত আজ তাহারাই বাসবদত্তাকে ঘৃণার সহিত পরিহার করিয়াছে, একমাত্র পুরাতন দাসীই বাসবদত্তার বিকৃত দেহের পার্শ্বে বসিয়া বধ্যভূমিতে প্রতীক্ষমাণ মাংসলোলুপ গৃধ্র গোমায়ু প্রভৃতির কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছে। উপগুপ্ত বাসবদত্তার এই শোচনীয় পরিণামের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। তখন বাসবদত্তার চেতনা কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে—উপগুপ্তের প্রতি অনুরাগবাসনা মৃত্যুপথযাত্রিণী এই নৃশংস গণিকার চিত্ত তখনও আচ্ছন্ন করিযা আছে। তখনও আপন রূপলাবণ্যের দ্বারা উপগুপ্তকে বিলোভিত করিবার ইচ্ছা বাসবদত্তার অন্তর হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই—

দাস্যা নিবেদিতং দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং শশিদ্যুতিম্।
পূর্বাভিলাষশেষেণ সা লজ্জাকুটিলাভবৎ॥
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ কেনাপি বাসনাভ্যাসবর্ত্মনা।
ন কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং রাগস্ত্যজতি দেহিনাম্॥
জঘনাবরণং কৃত্বা দাস্যা বসনপল্লবম্।
সা স্তনন্যস্তহস্তা তং বভাষে বিনতাননা॥
প্রযত্নেনাপি মহতা নায়াতস্ত্বং ময়ার্থিতঃ।
অধুনা মন্দভাগ্যায়াস্তব সন্দর্শনেন কিম্॥
যদা সমভবৎ কোঽপি ভাগ্যসৌভাগ্যবিভ্রমঃ।
ন দর্শনস্য কালোঽয়মিত্যুক্তং ভবতা তদা॥
কৃত্তাঙ্গী রুধিরাদিগ্ধা চ্যুতাহং ক্লেশসাগরে।
কালঃ কমলপত্রাক্ষ কিময়ং দর্শনস্য মে॥

উপগুপ্ত বাসবদত্তার এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ও করুণ বচন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইলেন— তাঁহার হৃদয়ে অনুশোচনা জন্মিল। ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বাসবদত্তাকে উদ্দেশ করিয়া উপগুপ্ত বলিতে লাগিলেন—

তোমার চন্দ্রসদৃশ কান্তি, সুবর্ণকদলী সদৃশ দেহের অপূর্ব লাবণ্য, পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল, অথবা কুবলয়দলেরও ক্লৈব্যবিধায়ি লোচনদ্বয় কোনটিই আমার ঈপ্সিত নহে। আমি শুধু আসিয়াছি কামের পরিণামবিরসতা দেখিবার জন্য। একদিন তোমার এই দেহ বরসৌরভবাসিত ও নানা বিচিত্রভূষণ ও অংশুকের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল, আজ সেই শোভার কি পরিণাম হইয়াছে দেখ! ইহাই বৈষয়িক বস্তুর স্বভাব। নানাবিধ ব্যসনের আকর, অস্থি-মাংস-মজ্জার সমাহার মাত্র,

জুগুপ্সিত এই দেহের প্রতি শুধু মোহবশতই প্রাণিগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিস্যন্দিনি দুরামোদে বিকৃত-চ্ছিদ্রসঙ্কুলে।
অহো মোহান্মনুষ্যাণাং কায়েঽপি প্রিয়ভাবনা॥

সুগতোপাসনাই এই দুঃখস্কন্ধ হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র পন্থা। সেই কল্যাণমিত্র ভগবান তথাগতের অনুশাসন যাহারা প্রণিধান সহকারে শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা আর কখনও এই নরকসদৃশ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না।

উপগুপ্তের এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার হৃদয়ে বিরাগের সঞ্চার হইল,— এই সংসার হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া সেই গণিকা পুণ্য ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করিল এবং 'স্রোতাপত্তি' ফললাভকরতঃ এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিল। তখন মথুরাবাসিগণও বাসবদত্তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যত্নসহকারে তাহার দেহ-সংকার করিল।

৪

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষেমেন্দ্রের 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থখানি প্রাচীন বৌদ্ধ অবদানসমূহেরই সংকলন মাত্র। 'উপগুপ্ত-অবদানে' বর্ণিত উপগুপ্ত-বাসবদত্তা সম্পর্কিত কাহিনীটিও পূর্বতন অবদান-সাহিত্য হইতেই সমাহৃত হইয়াছে। প্রাচীন মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাযান সম্প্রদায়ের অবদান-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন—'দিব্যাবদান' নামক গ্রন্থের ষড়্‌বিংশতিতম অবদানে ('পাংশুপ্রদানা-বদান') প্রাসঙ্গিকভাবে উপগুপ্ত কর্তৃক বাসবদত্তার উদ্ধারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লিখিত গ্রন্থে 'দিব্যাবদানমালা' এই নামে গ্রন্থ-খানির উল্লেখ আছে বটে, তবে পুঁথিখানি খণ্ডিত অবস্থায় ছিল বলিয়া দ্বাবিংশতিতম অবদান পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।[৮] সুতরাং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'উপগুপ্ত-অবদান' কাহিনীর সহিত পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ই বি. কাউএল্ (E. B. Cowell) এবং আর. এ. নীল্ (R. A. Neil), কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'দিব্যাবদান' গ্রন্থের রোমান্ হরফে মুদ্রিত একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯] এই গ্রন্থের ৩৫২-৩৫৫ পৃষ্ঠায় উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার কাহিনীটি লিপিবদ্ধ আছে। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র কাহিনীর সহিত 'দিব্যাবদানে'র অন্তর্গত কাহিনীর ঘটনাগত কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু 'দিব্যাবদানে'র রচনাশৈলী

এমনই প্রসাদগুণাঢ্য ও নিরাড়ম্বর যে আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ ঘটনাবলীও কাব্যোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'দিব্যাদানে'র রচনাশৈলী সম্পর্কে সুপণ্ডিত সম্পাদকদ্বয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

The Divyavadana, unlike the Mahavastu, is generally written in fairly correct Sanskrit; some parts of it indeed might almost be taken as a model of an unaffected prose style; simple as it is, it has a force of its own from its artless pathos and directness.[১০]

উপগুপ্ত-বাসবদত্তা সম্পর্কিত কথাংশের রচনাশৈলী সম্পর্কে এই মন্তব্য যথার্থ। রবীন্দ্রনাথ 'দিব্যাবদানে'র এই মুদ্রিত সংস্করণের সহিত পরিচিত ছিলেন কি না, বর্তমানে তাহা সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা'র উপগুপ্ত-অবদান হইতে 'দিব্যাবদানে'র কথাংশ যে বহুলপরিমাণে কাব্য-রসসিক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না—এবং রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে 'দিব্যাবদানে'র অন্তর্গত কথা ভাগেরই আকর্ষণ সমধিক হওয়া স্বাভাবিক। বাসবদত্তার রাজদণ্ডজনিত শরীরবিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া উপগুপ্ত যখন শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছেন, সেই অংশের বর্ণনা 'দিব্যাবদানে' সত্যই হৃদয়বিদারক—

> যাবদ্ একেন দারকেনোপস্থায়কেন ছত্রমাদায় প্রশান্তেনের্য্যাপথেন শ্মশানমনুপ্রাপ্তঃ, তস্যাশ্চ প্রেষিকা পূর্বগুণানুরাগাৎ সমীপেঽবস্থিতা কাকাদীন্ নিবারয়তি। তয়া চ বাসবদত্তায়া নিবেদিতম্, আর্য্যদুহিত-র্যস্য ত্বয়াঽং সকাশং পুনঃ পুনরনুপ্রেষিতা অয়ং স উপগুপ্তোঽভ্যাগতঃ, নিয়তমেষ কামরাগার্ত্ত আগতো ভবিষ্যতি। শ্রুত্বা চ বাসবদত্তা কথয়তি।
>
> "প্রণষ্টশোভাং দুঃখার্ত্তাং ভূমৌ রুধিরপিঞ্জরাম্।
> মাং দৃষ্ট্বা কথমেতস্য কামরাগো ভবিষ্যতি॥"
>
> ততঃ প্রেষিকামুবাচ। "যৌ হস্তপাদৌ কর্ণনাসং চ মচ্ছরীরাদ্ বিকর্ত্তিতৌ তৌ শ্লেষয়েতি।" ত্বয়া যাবচ্ছ্লেষয়িত্বা পটকেন প্রচ্ছাদিতা। উপগুপ্তশ্চাগত্য বাসবদত্তায়া অগ্রতঃ স্থিতঃ। ততো বাসবদত্তা উপগুপ্তমগ্রতঃ স্থিতং দৃষ্ট্বা কথয়তি। "আর্য্যপুত্র যদা মচ্ছরীরং স্বস্থভূতং বিষয়রত্যনুকূলং তদা ময়া আর্য্যপুত্রস্য পুনঃ পুনর্দূতী বিসর্জিতা, আর্য্যপুত্রেণাভিহিতম্—'অকালস্তে ভগিনি মম

দর্শনায়েতি।' ইদানীং মম হস্তপাদৌ কর্ণনাসৌ চ বিকর্ত্তিতৌ স্বরুধির-কর্দ্দম এবাবস্থিতা, ইদানীং কিমাগতোঽসি।"

৫

রবীন্দ্রনাথ 'অভিসার' কবিতায় মূল উপাখ্যানের বহু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মূলে উপগুপ্ত তখনও গন্ধাপণিক; হৃদয় কামবিমুখ বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তথাগতের সদ্ধর্মে দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু অভিসার কবিতায় দেখি—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তার সঞ্চার করিয়া ঘটনাটিকে রহস্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন —দূতীর মুখ দিয়া নহে, শ্রাবণ-নিশীথিনীর ঘনমেঘাবৃত গগনতলে ক্ষীণ প্রদীপালোকে অভিসার-সজ্জিতা বাসবদত্তা স্বয়ং তরুণ উপগুপ্তের নিকট আপন প্রণয় ব্যক্ত করিয়াছে—

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা।'

উপগুপ্তের সহিত বাসবদত্তার প্রথম দর্শনও যেমন আকস্মিক, অচিন্তিতোপনত, মৃত্যুপথযাত্রিণী বাসবদত্তার সহিত অন্তিম সাক্ষাৎও তদ্রূপ আকস্মিক। এবারে একক উপগুপ্ত চলিয়াছেন, চৈত্ররজনী জ্যোৎস্নাধবলিত—

বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।

বাসবদত্তা আজ নগরীর বহির্ভাগে পরিত্যক্ত—মথুরাবাসিগণ আজ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য কারণে—

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ॥

উপগুপ্ত বাসবদত্তার রোগশীর্ণ দেহ নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন, শুষ্ক অধরে জল ঢালিয়া দিলেন, শীত চন্দনপঙ্কে বাসবদত্তার দেহ লিপ্ত করিয়া দিলেন। আজ আবার জ্যোৎস্না-বিধৌত, কোকিল-কূজন-মুখরিত, পুষ্পসৌরভবাসিত রজনীতে অসীম গগনতলে উপগুপ্তের সহিত বাসবদত্তার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে—

'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়।'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়,—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি, বাসবদত্তা।'

৬

প্রত্যেক কবিই স্বতন্ত্র স্রষ্টা, সেইজন্যই প্রাচীন ভারতীয় কাব্যবিচারকগণ কবিকে 'প্রজাপতি' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইতিহাসের সর্বজনগোচর উপাদানকে তাঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিভার ও অনুভূতির সাহায্যে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিয়া থাকেন—সেইজন্য একই বিষয় লইয়া রচিত কাব্য বিভিন্ন কবির লেখনীতে বিভিন্ন রূপে ও রসে সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের উপাদান তাঁহাদের নিকট স্ব স্ব আদর্শ ও অনুভূতিকে রূপ দিবার উপকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইজন্যই আচার্য আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন—

ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যক্ত্বানমুগুণাং স্থিতিম্।
উৎপ্রেক্ষ্যোঽপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিতকথোন্নয়ঃ॥
সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাদিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
নতু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া॥

সুতরাং সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনীর যে রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অভিসার' কবিতায় সংঘটন করিয়াছেন, তাহাতে আপত্তির কিছুমাত্র নাই। কিন্তু, একটি প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়: কাহিনীর এই রূপান্তর সাধনের উদ্দেশ্য কি? কেবলমাত্র মূল কাহিনীর নগ্ন বীভৎসতাকে একটি অপূর্ব কাব্যসুষমায় আবৃত করিবার তাগিদেই কি রবীন্দ্রনাথ ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে অভিনবত্ব-সঞ্চারের আয়োজন করিয়াছিলেন, না অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্য কবির হৃদয়ের অবচেতন স্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিয়াছে ও কবির লেখনীকে আপনার অজ্ঞাতসারেই সঞ্চালিত করিয়াছে? 'অভিসার' কবিতার আলোচনায় এই প্রশ্ন যে অপ্রাসঙ্গিক নহে, তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

৭

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের প্রতি চিরদিনই গভীর শ্রদ্ধা বিরাজমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে বুদ্ধ শাক্যমুনিকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের দুইটি প্রধান মার্গ—একটি মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও অপরটি হীনযান বৌদ্ধধর্ম রূপে প্রখ্যাত। হীনযান বৌদ্ধধর্মের বাহন মুখ্যতঃ পালিভাষা ; অপরপক্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে।[১১] হীনযান বৌদ্ধধর্মে তথাগতপ্রতিপাদিত ধর্মের শুষ্ক তত্ত্বের দিক্‌টা যেমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মাধুর্যের দিক্‌টা ঠিক ততখানি প্রাধান্য লাভ করে নাই। এই জগৎ দুঃখময়, এই জগৎ ক্ষণিক,—ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভই সংসার-দাবানল-দগ্ধ মানবের একমাত্র কাম্য। শূন্যরূপ পরমতত্ত্ব বা নির্বাণ লাভই হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণের জীবনের চরম লক্ষ্য। হীনযানধর্ম প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিজে নির্বাণ লাভ করিতে পারিলেই জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হইল। অন্যান্য দুঃখার্তগণকেও তাহাদের শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিয়া জগতের দুঃখভার লঘু করা হীনযানী স্থবিরগণের সাধনপদ্ধতি নহে। নির্বাণও হীনযানমতে নেতিবাচক, তাহার মধ্যে মাধুর্যের আস্বাদ আছে বলিয়া মনে হয় না। অপরপক্ষে, মহাযান বৌদ্ধধর্মে মৈত্রী ও করুণার ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বের দিক্ নহে, নেতিবাচক শূন্যতারূপ নির্বাণ নহে, কিন্তু প্রেমের দিক্, করুণার দিক্, জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়া জাগতিক দুঃখ হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিবার অকৃত্রিম আগ্রহ—ইহাই হইতেছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষণ। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মই প্রাচীনকালে ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের এই করুণাঘন প্রেমিকরূপের বিকাশ ভারতবর্ষের জনসাধারণ ভুলিতে বসিয়াছে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

"কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়।"

অপিচ—"ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়

বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ-ধর্মের হৃদয়ের দিক্‌টা প্রকাশ করে।”—‘বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ’ : ঐ, পৃ. ৫৮

“বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণত হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

“তাহার একটি কারণ, মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।”—বুদ্ধদেব, পৃ. ২৯

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসাহিত্য বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও ভক্তির দিক্‌টাই তাঁহার কবিচিত্তকে সমধিকভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। শুষ্ক পুরাতত্ত্বের উপাদান সংকলন তাঁহার অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল না। বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত রূপ তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মতে—

“ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।···বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুকরা জোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে।”—ঐ. পৃ. ২৯-৩০

অপিচ—

“পুঁথিপড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় এই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস; তাহা আলোকহীন, চক্ষুহীন, স্পর্শগত অনুভবমাত্র। এইজন্য এইরূপ শাস্ত্র-গড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেককাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন।···আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই

আলোচনায় রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।"—বুদ্ধদেব : পৃ. ৩১

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও সাহিত্য—দুইই অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীত বিষয়গুলি শুধুই বুদ্ধির কোঠায় গিয়া স্তূপীকৃত নীরস বস্তুপুঞ্জে পর্যবসিত হয় নাই। তিনি অন্তরের অন্তরে ছিলেন কবি, পাণ্ডিত্যের উপাদান তাঁহার প্রতিভায় যতই থাকুক না কেন। সেইজন্য তিনি যাহাই অধ্যয়ন করিতেন সে-সবই তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শে সজীব হইয়া উঠিত। বৌদ্ধ শাস্ত্র, সাহিত্য ও ধর্মের চর্চা করিয়া তিনি ভারতের অতীত ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়কে মূর্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন এবং সেই অধ্যায়ের যিনি অধিনায়ক পুরুষ, ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ, তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে করুণা, প্রজ্ঞা ও মৈত্রীর জীবন্ত বিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হইলেন। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বুদ্ধের তপস্যা ততখানি নহে, যতখানি দুঃখার্ত প্রাণিবর্গের দুঃখ লাঘবের জন্য। সেইজন্য মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধদেব 'বৈদ্যরাজ' রূপে অভিহিত হইয়াছেন—

চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ॥

বুদ্ধদেবের এই করুণাঘন বৈদ্যরাট্-রূপই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল সর্বাধিক পরিমাণে। তাই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক ; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধু-কর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে ; যে মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।"—ঐ. পৃ. ১২

আর একজায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশে আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

"এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা।"—'ব্রহ্মবিহার' : ঐ. পৃ. ১৭-১৮

আবার—

'প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশঃ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।"—ঐ. পৃ. ২৩

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, তাই মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যের হৃদয়বৃত্তিপ্রধান এই মৈত্রীসাধনের পদ্ধতি তাঁহার কবিহৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল, এবং এই কারণেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের প্রকাশ— যাহাতে সর্বপ্রথম বিস্মৃতপ্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের সুবিশাল সাহিত্য বিদ্বৎসমাজের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়,—তাঁহার কবিপ্রতিভার উন্মেষের ইতিহাসে একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার উৎস—এই একটিমাত্র গ্রন্থ; ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে।

৮

'অভিসার' কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত মন্তব্যগুলি একেবারেই অবান্তর নহে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যেমন 'প্রেমের মঙ্গল দিনকর' রূপে কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ উপগুপ্তও ছিলেন বৌদ্ধসঙ্ঘে বুদ্ধেরই 'প্রতিভূ' স্বরূপ।[১২] মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি 'অলক্ষণকো বুদ্ধঃ' রূপে পরিচিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যেমন বুদ্ধদেবকে মৈত্রী ও করুণার আকররূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, সেইরূপ উপগুপ্তের মধ্যেও তিনি সেইসকল অনুরূপ গুণেরই সমাবেশ কল্পনা করিয়াছেন। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র বা 'দিব্যাবদানে'র উপগুপ্ত চরিত্রে করুণা অপেক্ষা নির্বেদ ও বৈরাগ্যের লক্ষণই বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই বিকৃতসর্বাঙ্গী মুমূর্ষু বাসবদত্তাকে জগতের নিঃসারতা ও কামরাগের পরিণামবিরসতা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া তাহার চিত্তে বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ মোক্ষপথে পরিচালিত করাই বধ্যভূমিতে উপগুপ্তের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ। কিন্তু ইহাতে মহাযানের করুণা ও মৈত্রীর ভাব ততটা প্রকাশ

পায় নাই, যতটা প্রকাশ পাইয়াছে হীনযানসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের দিক্, বিষয়বৈরাগ্যের দিক্। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই উপগুপ্তের চরিত্র মহাযান বৌদ্ধমতের আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত করিবার সাহস তাঁহার হইয়াছিল—এবং রবীন্দ্রনাথ-অবলম্বিত পরিসংস্কারই কি বাসবদত্তার শোচনীয় পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর সমঞ্জস বলিয়া প্রতিভাত হয় না? তাই উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে বৈরাগ্য-জনক উপদেশ দিতেছেন না, কিন্তু—

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি' দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির'-পরে
লেপি দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দনপঙ্কে।

ইহা কি ভগবান্ তথাগতেরই করুণাঘন 'বৈশ্বরাট্' রূপ নহে? এবং মহাযান সম্প্রদায়ের মতে 'অলক্ষণক বুদ্ধ' স্থবির উপগুপ্তের চরিত্রের মৈত্রী ও করুণার ভাব, যাহা রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধ-দেশনার মর্মকথা, আর কোনও উপায়েই কি তাহাকে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইত? সত্যই, "সন্ন্যাসী-উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায় এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল।"

১ তু° "It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M.A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents."—R. L. Mitra: *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*: *Preface*, p. xliii.

২ অথচ এই 'অবদানশতকে'রই একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'পূজারিণী' কবিতা রচনা করেন।

৩ রচনাকাল "১৯ আশ্বিন, ১৩০৬।"

৪ তু° "............the extensive Avadana book of the Kashmirian poet Ksemendra, the Avadanakalpalata, which was completed in 1052 A.D.... —Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. II, p. 293.

৫ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত *Bibliotheca Indica* গ্রন্থমালায় ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদান-কল্পলতা' পরবর্তীকালে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত পাঠের সহিত উহার তিব্বতী ভাষান্তরও উক্ত সংস্করণে পাশাপাশি মুদ্রিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য: *Avadana-Kalpalata* (Sanskrit and Tibetan)—Author Ksemendra—Editors: Saratcandra Dasa, H. M. Vidyabhusana and Satiscandra Vidyabhusana.—1889-1917.—2 Vols. in 24 fascicles." 'অভিসার' কবিতার রচনাকালে উপগুপ্তের কাহিনীসম্বলিত মূলগ্রন্থের অংশ প্রকাশিত হয় নাই।

৬ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 67.

৭ তু° "The huge collection of legends, too, in which Ksemendra has recast the Buddhist Avadanas in the style of ornate court poetry, contains more edifying stories than skilfully and tastefully narrated ones. The Buddhist tendency of self-sacrifice is here brought to a climax with such subtelety, the doctrine of Karman is applied so clumsily, and the moral is pointed in such an exaggerated manner, that the story often achieves the reverse of the desired result."—Winternitz: *HIL*, Vol. II, p. 293.

৮ তু° *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, pp. 304 ff.

৯ *The Divyavadana*,/A Collection of Early Buddhist Legends New First Edited From/The Nepalese Sanskrit MSS. in Cambridge and Paris./By E. B. Cowell, M.A. and R.A. Neil, M.A./Cambridge: At the University Press. 1886.

১০ ঐ. Preface, pp. vii-viii.

১১ তু° "যেমন বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাঙ্করভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালিগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে!"—বুদ্ধদেব, পৃ. ৪০।

১২ তু° "The name of Upagupta occurs incidentally in the scriptures and commentaries of the so-called Northern or Mahayana Buddhists, as the patronymic of the fourth member of the series of patriarchs of the Buddhist Church, in direct succession from the epoch of Sakya Muni's death. He is also referred to therein, as being the converter and spiritual adviser of the great emperor Asoka; and it is in this respect, as the alleged inspirer of Asoka's great missionary movement, which led to Buddhism becoming a power in the world, that Upagupta claims our special notice. Of such importance is he considered, that his coming

is alleged to have been predicted by both Buddha himself and by his favourite disciple Ananda. And of him Taranatha, the Tibetan historian, writes ; "Since the death of the Guide (Buddha) no man has been born who has done so much good to living beings as this man.' (Beal's *Si-yu-ki*, I. 182, n. 48)."—L. A. Waddell : *Upagupta, the Fourth Buddhist Patriarch, and High Priest of Asoka.* (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1897, Vol. LXVI, No. 1, p. 76).

বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮০ শক ॥

‘ছিন্নপত্র’ ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান

সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সঙ্কেতে।[১]
—রবীন্দ্রনাথ

১

‘ছিন্নপত্রে’ সংগৃহীত পত্রখণ্ডগুলির রচনাকাল ৩০ অক্টোবর ১৮৮৫ হইতে ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক চব্বিশ বৎসর হইতে কিঞ্চিদধিক চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে। কবির যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যৌবনমধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিস্তৃত খণ্ডজীবনের যে আলেখ্য এই পত্রাংশগুলিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা নানা দিক্ দিয়া বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট লিখিত নিম্নোদ্‌ধৃত পত্রাংশটিতে কবি তাঁহার তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

“বহুদিন চিঠিপত্র লিখি নি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চ’লে যাচ্ছে, কেবল বয়স বাড়ছে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম, এইবার সাতাশে পড়েছি— এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ছে; আর কোনো ঘটনা তো দেখছি নে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ, অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই? এখনো মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে— কই, তত্ত্বজ্ঞান কই? লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে, ‘তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই? এতদিন আশায় আশায় ছিলুম। তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত। কিন্তু তাই ব’লে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই— চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানিসংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হতে পারে এবার তার একটা হিসেব চাই।’ আর তো ফাঁকি

দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু! যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে।...হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই-সকল কথার উদয় হল। আসল কথা—যতদিন আপনি কোনো লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিয়ে তার প্রতি এক প্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না—তার যে কী হবে, কী হতে পারে কিছুই বলা যায় না; তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়—বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে তার চার দিক থেকে কতকগুলো লোক ঝরে যায়, কতকগুলো লোক স্থায়ী হয়—এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না। নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।"[২]

কবির এই উক্তি লঘু পরিহাসচ্ছলে করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে সবটাই যে পরিহাস নহে, কতকাংশে সত্যতাও যে আছে তাহা কবিজীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলির সহিত যাঁহারই পরিচয় আছে তিনিই স্বীকার করিবেন। 'ছিন্নপত্রে'র পর্ব কবিজীবনের এক প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতির পর্ব, লোকলোচনের অন্তরালে নির্জনবাসের মধ্যে নিরন্তর সাধনার পর্ব; স্নিগ্ধ প্রসন্ন পল্লীপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কবির অন্তঃপ্রকৃতি তখন আত্মসমাহিত ও প্রশান্ত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্য-সৃষ্টিতে যেসকল চিন্তা ও ভাবনা পুষ্পিত পল্লবিত ও ফলিত হইয়া উঠিয়াছে, 'ছিন্নপত্রে' তাহাদেরই বীজাকারে প্রথম নিঃসংশয় আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। "সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়—বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না।" এক দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আর-

একদিক দিয়া ইহার সত্যতাও তুল্যরূপে অবিসংবাদিত। কেননা, প্রাক্-'ছিন্নপত্র'-পর্বের সাহিত্যকৃতি যেমন কবির পরবর্তী দীর্ঘজীবনের বিচিত্র সৃষ্টির রূপকল্প ও শিল্পসৌন্দর্যের অজস্র বৈভবের নেত্রপ্রতিঘাতী ঔজ্জ্বল্যের নিকট হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে, তেমনই ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'ছিন্নপত্রে'র খণ্ডিত পত্রাংশগুলিতে কবির অন্তর্জীবনের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার পরবর্তী সর্ববিধ শিল্পকর্মের ও অভীপ্সার সারসংগ্রহ। কবিমানসের সেই অভীপ্সাই নানা আকারে, নানা অবস্থায় বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু কবির সেই মানস-আকৃতি পরবর্তী কোনও বিরোধী আদর্শের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে কি-না সন্দেহ। বরং 'ছিন্নপত্রে' কবির মানস-ভূমণ্ডলের যে নীহারিকাচ্ছন্ন অস্পষ্ট আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে, তাঁহার উত্তর-জীবনের সাহিত্য ও শিল্প-কর্মে তাহারই উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় প্রকাশ সংঘটিত হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে কবিজীবনের একটি অনবদ্য **testament** বলিয়া নির্দেশ করিলেও নিতান্ত ভুল করা হইবে না।

২

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই নগরের কলকোলাহল হইতে দূরে নির্জন প্রকৃতির প্রশস্ত উৎসঙ্গের স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাই যখনই তিনি কলিকাতার নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও সংকীর্ণতার দ্বারা পীড়িত বোধ করিতেন তখনই পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গলাভের জন্য শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর অথবা বোলপুরের দিকে রওনা হইতেন। নাগরিক-জীবনের চঞ্চল পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহের সহিত মফস্বলের স্থির-মন্থর কালস্রোতের তুলনা করিয়া তিনি একটি পত্রে লিখিতেছেন—

"সবে দিন-চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে, আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব।

"আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি; আর, সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে; কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা-অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়; কোনো কোনো ক্ষণিক সুখদুঃখ মনে

হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করছি। সেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘ কাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত।"[৩]

পল্লীর এই নিস্তব্ধ রহস্যনিকেতনে কবির চিত্ত নিরন্তর প্রকৃতির অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকিত—

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্‌টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন—আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক্। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।"[৪]

কবি তাঁহার বোটের উপর শুইয়া রহস্যময়ী রজনীর নীরব বার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেন—প্রকৃতির অনন্ত শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিতেন।···কেন যে কখনও কখনও অকারণে তাঁহার চোখ অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিত তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।—

"আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব।···একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে।···মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই—বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে।

এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্য প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকাল অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।"[৫]

এই নির্জন রহস্যময়ী প্রকৃতির নিবিড় স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে মানবসমাজের কোলাহল ও কর্মতৎপরতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি আপনার অন্তরের অলক্ষ্য অন্তঃপুরের মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইতেন। মানুষের—তা সে যতই অন্তরঙ্গ ও আত্মীয় হউক-না কেন, সঙ্গ তখন তাঁহার নিকট অসহনীয় বোধ হইত—

"আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের কারখানাঘরের মতো; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে—কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না— কখন্ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্য অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন।...অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক কিন্তু নির্জন জীবনের পক্ষে আঘাতজনক। কেননা, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে; সুতরাং সেই সময়ে মানুষ বড়ো বেশি নিজেরই মতো অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়— সে অবস্থায় সে লোকসংঘের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যপ্রকৃতির একটা গুণ এই যে, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে মানুষের মনকে সে আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়; সে নিয়ত সঙ্গদান করে, তবু সঙ্গ আদায় করে না।..."[৬]

এইভাবে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির রূপসুধা কবি আকণ্ঠ পান করিতেন, তাহার অন্তরের গোপন বাণীটি কান পাতিয়া শুনিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু শুধুই নিস্তব্ধ ধ্যান নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিচিত্র বিভাগের সহিত আপনাকে নিরন্তর যুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য কবির কী ব্যগ্রতা।

৩

১৮৯৩ সালে লিখিত একটি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা-কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তারপ্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ— তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।"[৭]

'ছিন্নপত্র'-পর্বে কবি কত বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলনে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন, তাহার মোটামুটি একটা রেখাচিত্র আমরা পত্রাংশগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া খাড়া করিয়া তুলিতে পারি। তাঁহার বাল্যাবস্থায় বয়োজ্যেষ্ঠগণের তত্ত্বাবধানে যে নানাবিদ্যার আয়োজন হইয়াছিল তাহা তৎকালে যতই ভীতিপ্রদ ও অরুচিকর বলিয়া মনে হউক-না কেন, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধানলের উন্মেষ-সাধনে যে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। ১৮৯৩ সালে একটি পত্রে কবি লিখিতেছেন—

"এই বোটটি আমার পুরানো ড্রেসিং-গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।"[৮]

৪

'ছিন্নপত্রে'র পত্রাংশগুলিতে কবির বিদ্যানুশীলনের বিচিত্র আয়োজনের যে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ১৮৮৮ সালে শিলাইদহ হইতে লিখিত পত্রে কবি জানাইতেছেন—"গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি—ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি— আমি একখানা কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম— Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subject-এর বই একটা বাতির আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম।"[৯]

রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থও কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটি হইতে জানা যাইবে—

"এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্‌স্ অফ পলিটিক্‌স্ এবং প্রব্‌লেম্‌স্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ শাদাসিধে, সহজ, সুন্দর, উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল, কোমল, সুগোল, করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে।...যাই হোক, এলিমেন্ট্‌স্ অফ পলিটিক্‌স্ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়; একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।"[১০]

কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ ছিল কালিদাসের রচনাবলী— বিশেষ করিয়া মেঘদূত, এবং বৈষ্ণবপদাবলী। ১৮৯৩ মার্চ মাসে তিরন হইতে লেখা একটি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"...মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা একরকম ফুরাল, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে...বাসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুরফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনও সে ভাবের নয়— বাদলার পর বাদলা। এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখে-শুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কটকের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত

শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্রস্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না—কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়।...এইজন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়; তার সবগুলিই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়; কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।...যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত, ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।"[১১]

'মেঘদূত' কবিকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক মাত্রই জানেন। এইস্থলে 'ছিন্নপত্রে'র কয়েকটি পত্রাংশ সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

"কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো, তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না। জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয় বার আসবে না—ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে—সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে।...হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশজোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত সুখদুঃখ-বিরহমিলন-ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথমদিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে— অবশেষে এক সময় আসবে যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে; ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই।..."[১২]

পুরী হইতে লিখিত আর-একটি পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"কাঠজুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের

পাল্কীতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধূধূ করছে। ইংরেজিতে একে যে নদীর বিছানা বলে—বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো—নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে তেমন তার ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে, সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি। এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর একটি উপমা পাওয়া গেল।"[১৩]

আর-একস্থলে প্রকৃতির শোভা দেখিয়া কবির মনে শকুন্তলার একটি দৃশ্য উদিত হইতেছে—

". .এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপর সূর্যোদয় হয়। দুইধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অপরিণত শাল গাছ, এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্য প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থিরভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে বলব ? কালিদাসের শকুন্তলায় আছে দুষ্মন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসল-ভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়-চক্ষে চেয়ে দেখছে।"[১৪]

সাজাদপুর হইতে লিখিত একটি পত্রখণ্ডও কবির অসীম কালিদাস-প্রীতির নিদর্শন হিসাবে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির

চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না, 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।' বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্ট-মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল।..

"পোস্টমাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা ব'সে গেছেন, এমন সময় শঙ্খ এবং তূরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ প'রে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে। তারপরে সুনন্দা এক-একজনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করেছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে এর অবশ্য-রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।"[১৫]

কালিদাসের কাব্য কবির চেতনার সহিত কিরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, উপরের উদ্ধৃতিগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালিদাসের কাব্যপাঠ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কেবল মানস-বিলাস মাত্র ছিল না, উহা যে তাঁহার অন্তরের অদম্য রসপিপাসার পরিতৃপ্তিসাধনের অন্যতম প্রধান সহায় ছিল, তাহা 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত কবির একটি পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রটি যদিও পরবর্তীকালের রচনা, তবুও কবির মজ্জাগত কালিদাস-প্রীতির অপূর্ব সাক্ষ্য হিসাবে ইহা স্মরণীয় এবং 'ছিন্নপত্রে'র উদ্ধৃত অংশগুলির সহিত একাত্মতা-সূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে জগদীশচন্দ্রের জয়সংবাদ পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া অন্তিমছত্রে জানাইতেছেন—

"পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।"[১৬]

প্রবাসী প্রিয়তম বন্ধুর নিকট প্রীতির অর্ঘ্য স্বরূপ আশ্রমবৃক্ষ হইতে শিরীষ পুষ্প পত্র মধ্যে প্রেরণ করার কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কাহারও মনে উদিত হইত কি? ইহাত' শুধু বুদ্ধি দিয়া কালিদাসকে ভালো লাগা নহে, সমস্ত প্রাণমন দিয়া

ভালোবাসা, মহাকবির সুকুমার শিল্পকলাকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া।[১৭]

'জীবনস্মৃতি' যাঁহারাই পড়িয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আবাল্য আকর্ষণের কথা অবগত আছেন। কবি নিজেই নানাস্থলে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব কবিতা—এই দুইএর সংমিশ্রণে তাঁহার মানসিক আবহাওয়া রচিত হইয়াছে। 'ছিন্নপত্রে'র নানাস্থলে পদাবলী-সাহিত্যের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারা যায় কালিদাস-প্রীতির মতই কবির পদাবলী-প্রীতি ছিল সহজাত। শিলাইদহ হইতে লিখিত একখানি পত্রে কবি বলিতেছেন—

"এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া।"[১৮]

বোলপুর হইতে লিখিত আর একখানি পত্রে কবি বর্ষণমুখর গভীর নিশীথিনীতে বৈষ্ণব কবিগণ-কর্তৃক রাধিকার অভিসার-বর্ণনার যে সকৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য—

"বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমার আবার চোখে eye-glass ছিল; সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চষমা ধ'রে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে, পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলেছি। যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িণীর বাড়ি থাকত, আমার চষমা কোঁচা সামলাতুম না তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেকক্ষণ ভাবলুম—বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখিছেন; কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি, এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কিরকম হত সে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। বেশবিন্যাসেরই বা কি রকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি ক'রে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না। কেবল মানসচক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে, যমুনার তীরপথে, প্রেমের আকর্ষণে, ঝড়-বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন। পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় ব'লে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন;

কিন্তু পাছে ভিজে যান ব'লে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান ব'লে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যক জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত!"[১৯]

আর-এক পত্রে দেখিতে পাই কবি বোটে করিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিয়া চলিতেছেন, বর্ষাপ্রকৃতির শ্যাম সমারোহ তিনি মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করিতেছেন, আর বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষাবর্ণনা তাঁহার মনে পড়িতেছে—

"আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে। খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘন নীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরুগুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা-বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়; এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[২০]

বৈষ্ণব কবিতা কিভাবে তাঁহার কবিদৃষ্টিকে প্রভাবিত করিয়াছিল, কবির তরুণ বয়সের এই স্বীকারোক্তি তাহার এক নিঃসংশয় সাক্ষ্য।

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত 'ছিন্নপত্র'-পর্বের অন্তর্ভুক্ত একখানি পত্র হইতে জানা যায় কবি কিরূপ অভিনিবেশ সহকারে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' পাঠ করিতেছিলেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সুপ্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী' সমালোচনা যে কবির পরোক্ষ-প্রত্যয়-সঞ্জাত নহে, বাণভট্টের গদ্যশিল্পের প্রকৃত রসাস্বাদনের জন্য যে কবি ছাত্রের ন্যায়ই এই দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি—

"হাঁ—গৃহ অর্থে 'কক্ষ' শব্দের ব্যবহার কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই-একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে। কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েছে—আরো ততগুলো পাতা বাকী আছে।"[২১]

ইহারই কিছু পরবর্তীকালে রচিত 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্ভুক্ত এক চিঠিতে কবি বলিতেছেন—

"'পশুপ্রীতি' বলে ব—একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে; আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।...কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব—কে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি।[২২] পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরই মতো,

একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই, এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।"[২৩]

৫

এই যুগে কবি যে শুধু রস-সাহিত্যেই আপনাকে আকণ্ঠ নিমগ্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভের আগ্রহ তাঁহার কিছুমাত্র কম ছিল না। আমরা জানি উপনিষদের মন্ত্রপাঠ আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহর্ষি-পরিবারের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক উপাসনার অঙ্গ ছিল। কিন্তু উপনিষদের প্রতি কবিচিত্তের অনুরাগ শুধু মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই চরিতার্থতা লাভ করিত না। তিনি উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মননের দ্বারা উপলব্ধি করিবার জন্য সতত যত্নশীল ছিলেন। 'ছিন্নপত্র'-পর্বে উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অনুশীলন করিতেছিলেন তাহার পরিচয় আমরা পাই নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে—

"এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি। তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ ও তার অনুবাদ আছে। তার থেকে আমার অনেক সাহায্য হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্তমত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারই একেবারে গর্ড্যন-গ্রন্থি ছেদন ক'রে বসে আছেন —সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা চেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে এ কথা স্থান দিতে পারে। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসংগত আসলে তা নয়— বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদী-কল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধ জন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম— সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে

ধরে এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া ব'লেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি অতি ঈষ—ৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি ; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।"[২৪]

আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ যে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল ইহা আমরা তাঁহার 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলী হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। 'ছিন্নপত্রে'র উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটিতে তাহারই আভাস আমরা পাইতেছি।

বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য কবি কম অধ্যবসায়ের সহিত এই সময়ে অনুশীলন করেন নাই। ১৮৯৩ সালে তিরন হইতে লিখিত পূর্বোদ্‌ধৃত পত্রে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর'এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*[২৫] যে কবির সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কিরূপ গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের নিকট অজ্ঞাত নয়। শুধুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু আহরণের অফুরন্ত ভাণ্ডার রূপে নহে, কবি মহাযান বৌদ্ধধর্মের শাসনপ্রণালী ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পাইলেন এই গ্রন্থের মাধ্যমেই। হীনযান মতাবলম্বীর নির্বাণ-সাধনা যে কবির মনঃপূত ছিল না, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ও ভক্তিসাধনাই যে কবিকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্তীকালে রচিত কবির বহু প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি। 'ছিন্নপত্রে'র একটি পত্রেও এই হীনযান মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন কবি বলিতেছেন—

"কেননা সৃষ্টি কখনোই সম্পূর্ণ সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না— কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন— কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায় তা হলে, জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায় ; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে

পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ সব'—তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।"[২৬]

পত্রাংশটুকুরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই দীর্ঘকাল ব্যবধানে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীরই নিকট লিখিত কবির আর একখানি পত্রে। কবির বয়স তখন সপ্ততিবর্ষ। কবি বলিতেছেন—

"হিসাব করে যদি দেখিস্ তো দেখতে পাবি বয়স হোলো প্রায় সত্তর, অর্থাৎ বৈতরণীর ধার ঘেঁষে চলেচি। কিন্তু বোধ হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি আছে, তাই যদিচ ঘাটে আসন পেতেছি তবু খেয়ায় এখনো জায়গা হোলো না। একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে সেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবার মাত্র প্রমাণ করতে পারে, সে হচ্চে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাইবা হোলো— কিছুদিন বেঁচেছি, অত্যন্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্ছি আমি— অন্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি—অসীম জগতে এই পরমাশ্চর্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ো যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেচেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে— কিন্তু আমি বলি হওয়াটা যদি মিট্‌ল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়। রুগী বল্‌চে, কব্‌রেজ মশায়, জ্বর ছাড়াও— কবিরাজ নস্য নিয়ে বল্‌লেন দেহ ত্যাগ করলে জ্বরের উৎপাত একেবারে ঘুচবে। রুগীর বক্তব্য এই যে দেহটার জন্যেই জ্বরের অবসান কামনা করা, দেহটার অবসান যদি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জ্বরটা না হয় রইল। আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি? মৃত্যুতে ওটা শেষ হয় কি না হয় জানি নে, কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই

যে সব সন্ন্যাসী ওটাকে কেবলই রগ্‌ড়ে মুছে ফেলবার চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার বনিবনাও হোলো না। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেচে, অতএব তাকে নিন্দে করব না।. ."[২৭]

তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে 'ছিন্নপত্র'-পর্বে জগৎ ও জীবনসম্পর্কে বত্রিশ বৎসর বয়সে তরুণ কবির মনে যে ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, শঙ্করের মায়াবাদ এবং হীনযান বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব-সম্পর্কে কবিমানসে যে প্রতিক্রিয়ার উদয় হইয়াছিল, তাহা বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা অর্জন করিয়াছে, কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

৬

পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থরাজি কবির বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষানলের ইন্ধন জোগাইত। ১৯০০ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বিলাতপ্রবাসী বন্ধুবর জগদীশচন্দ্রের এক পত্রের উত্তরে কবি লিখিতেছেন—

"আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার 'প্রকৃতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন— সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"[২৮]

কবির এই উক্তি নিতান্তই বিনয়প্রসূত। ইতিহাস পুরাবৃত্ত এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বা archæologyও তাঁহার ঔৎসুক্যের পরিধির বহির্ভূত তো ছিলই না; বস্তুতঃ এমন-সব প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কারের সহিত কবি পরিচিত ছিলেন যাহা আমাদের দেশের বহু ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক-প্রধানেরও জ্ঞানের অগোচর। এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি। 'শেষের কবিতা' কবির পরিণত-বয়সের রচনা। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত রায় তাহার বন্ধু শোভনলাল সম্পর্কে নায়িকা লাবণ্যের কাছে বলিতেছে—

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়— রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা? ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।. .

"এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয়। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারতসরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার-পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে— কখনো কাশ্মীরে, কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্মপ্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।. ."[২১]

এই উক্তি যে দাম্ভিক অমিত রায়ের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, প্রৌঢ় কবির গভীর প্রত্নতত্ত্ব-প্রীতির প্রচ্ছন্ন সাক্ষ্য যে উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা হয়তো অনেকেরই মনে উদয় হইবে না। ফরাসি অধ্যাপক ফুশে (A Foucher) ১৯০১ সালে *Bulletin d' Ecole Francaise d' Extreme-Orient* নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রাচীন ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম—*Geographie ancienne du Gandhara:* Itinéraire de Hiuan-tsang en Afghanistan. পরবর্তী কালে তিনি এই বিষয় লইয়া আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে *La vieille route de Gandhara a Taxile* নামক তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে ফরাসি পণ্ডিত ফুশে'র এই গবেষণাকে লক্ষ্য করিয়াই অমিত রায়ের মুখ দিয়া শোভনলাল-প্রশস্তি গাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মহর্ষির সাহচর্যে যে দেশভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই দেশভ্রমণের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহারই পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য কবি চিরকাল ভ্রমণবৃত্তান্তের বই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

সংকীর্ণ গৃহকোণে তাঁহার দেহ ও মন দুইই সমানভাবে পীড়িত হইত। 'ছিন্নপত্রে'র এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন—

"ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে—বেশ একটি ছবির মত দেশ—পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ কিছুতে হাত না দিয়ে দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত-পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি—বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাতকাটা বই। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতি সাধন করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে, কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম; সেই রকম বই লিখতে অসামান্য ক্ষমতার দরকার।..."[৩০]

বোলপুর হইতে লিখিত আর-একটি পত্রে কবি জানাইতেছেন—

"কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বতভ্রমণের বই পড়েছি। একরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারিনে। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই—মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি বাঁকা রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক কিম্বা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে চলতে থাকে, তার বড়ো একটা টান আছে—মাঠ তাতে আরও যেন ধূ ধূ ক'রে ওঠে, মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে চলে যেতে থাকে; তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ আকাশ আরও যেন বেশি ক'রে অনুভব করতে পারি।"[৩১]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—ইহার মধ্যে 'ছিন্নপত্রে'র উদ্‌ধৃত পংক্তি-কয়টির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবানুষঙ্গ লক্ষণীয়।

জীবনীসাহিত্যও কবির কম প্রিয় ছিল না। ডাউডেন-রচিত ইংরেজ কবি শেলির সুপ্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ যে কবি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্‌ধৃত পত্রাংশটুকু তাহার প্রমাণ—

"আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপর

সবটা খুবই ছোটো ; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বছর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটিমাত্র ভলুম জীবনচরিতের সৃষ্টি করেছেন ; তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে বকুনি বিস্তর আছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছরে বোধ করি একখানা ভলুমও পোরে না।...”[৩২]

শিলাইদহ-প্রবাসকালে কবির নিত্যসহচর ছিলেন আমিয়েল সাহেব—

“আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টেপাল্টে দেখি ; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি ; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এই বই-এর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো।...আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে ; ব—র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।”[৩৩]

‘ছিন্নপত্রে’র যুগেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত কবির এক পত্রে দেখি—

‘Bashkirtscheff-এর Journal আমিও পড়ছি—মন্দ লাগ্‌চে না কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে।...”[৩৪]

৭

‘ছিন্নপত্রে’র যুগে রবীন্দ্রনাথ জার্মান ভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছিলেন, এবং বেশ কিছুটা যে অগ্রসরও হইয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা পাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে শিলাইদহ হইতে কবি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিতেছেন—

“জর্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এরকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জার্মান ভাষা বুঝে ওঠা কিরকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজে অনুমান করতে পারবে।...”[৩৫]

‘ছিন্নপত্রে’র অন্তর্ভুক্ত আর-একটি পত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে—

“Goethe-র একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু

বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাই।"৩৬

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত *The Religion of an Artist* শীর্ষক সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জার্মান ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন—

"I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

"I also wanted to know German literature and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

"Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*. I believe I found my entrance to the place, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in

some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dusky to me."

ইহারই সঙ্গে ফরাসি ভাষা শিক্ষার জন্যও কবি তৎপর হইয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য জগদীশচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে আমরা পাই। পত্রখানি 'ছিন্নপত্র'-পর্বের কয়েক বৎসরের ব্যবধানে রচিত—

"চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওলটাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানা পেয়ে মৃতভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হয়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি।"[৩৭]

অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সুবিদিত; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য ও প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন স্বরূপ এই উন্নত ভাষাটির চর্চার প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ঐ বিষয়ে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। কেননা, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট লিখিত একাধিক পত্রে কবি ফরাসি ভাষায় আপনার দক্ষতার অভাব লইয়া অভিযোগ করিতেছেন, দেখা যায়। কয়েকটি পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন— বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই।···বেলজিয়মে যে নূতন ইস্কুল হয়েছে তার খবর সবুজপত্র থেকে দাবী করচি। তুমি সম্প্রতি নানা লেখা, কিম্বা সম্ভবত না-লেখা, নিয়ে ব্যস্ত আছ— অতএব আমার পরামর্শ, বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত আশার কথা, জ্যোতিদাদা ওখানে আছেন। তিনি এটা পেলে হয়ত ফস্ করে এটাকে গৌড়ীয় ভাষায় ঢালাই করে নিতে পারেন। যাই হোক তোমাদের যে রকম মর্জি তাই কোরো কিন্তু আমার এটাতে গরজ আছে। এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Education Morale, Sociale et Artistique"— ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জমা নয়, কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবেনা?"[৩৮]

অপিচ—

"ফরাসী চিঠিগুলো আমাকে তর্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরো না।···"[৩৯]

কবির আগ্রহেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য অধ্যাপনার সূচনা হয় ; এবং বেনোয়া (Benoit) নামক একজন ফরাসি অধ্যাপকের উপর অধ্যাপনার ভার অর্পিত হয়— ইহা আমরা জানি।[৪০]

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' হইতে কয়েকটি পংক্তি ফরাসি সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগের সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্ধারযোগ্য—

"বস্তুত তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। সুরেনের এক জন্মদিনে তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসী শিখতুম বলে একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনে বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্য কঁৎদ্‌লীল্, লা ফঁতেন প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। এখনো সেই বইগুলি শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে।"

রবীন্দ্রনাথের জার্মান ও ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয়তো ততখানি গভীর ছিল না ; কিন্তু এক দিক দিয়া তাঁহার এই উদ্যম যে ব্যর্থ হয় নাই তাহা কিছুটা বুঝিতে পারি বাংলা ভাষাতত্ত্ব লইয়া তাঁহার রচিত অগণিত প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। বিভিন্ন ভাষার গঠন ও প্রকৃতি, ধ্বনিতত্ত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের যে ক্লেশ তিনি যৌবনকালে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছিল বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনার কালে।

৮

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট এক চিঠিতে লিখিতেছেন—

"...আমার বিষয়ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করি নি। এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরামকেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কিন্তু বুঝে নিয়েছি সে আমার কপালে নেই। টাকার যা সংগতি হয়েছিল তাতে কিছুই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু আমার প্রকৃতির মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন বসে,

যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বল্‌তে হয় Thy need is greater than mine....”[৪১]

রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একই আধারে কত বিচিত্র উপাদানের যে সমাবেশ হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি কবি। তবুও কবিত্ব শক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু পাণ্ডিত্যের কথা ধরিলেই আধুনিক কালে তাঁহার ন্যায় বহুজ্ঞ বা ব্যুৎপন্ন পুরুষ আমাদের দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। এই নিছক মনীষা বা পাণ্ডিত্যের প্রভা তাঁহার কবিশক্তির ভাস্বর জ্যোতিশ্ছটায় ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের হৃদয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ মননশীলতা বা জ্ঞানার্জন-স্পৃহার প্রতি যে আজন্ম সহজাত আকর্ষণ ছিল, এবং সাহিত্যসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যে তিনি সেই জ্ঞানযোগীর নির্লিপ্ত উদাসীন মূর্তির দিকে সস্পৃহ লুব্ধ নেত্রে তাকাইতেন— আপনার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে যাহার আভাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পত্রধারার নানাস্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হইতে পারিত, অথচ হয় নাই— তাহার জন্য কবির অনুশোচনা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও নিরলস জ্ঞানসাধনার যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিবার আমরা চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কবিমানসের ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ইতিহাসের যথাযথ আলোচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। গ্রন্থকীট পণ্ডিত অনেকেই আছেন। কিন্তু এমন জ্ঞানযোগী দুর্লভ যাঁহার প্রতিভার জারকরস-স্পর্শে তথ্যভারাক্রান্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য রসস্নিগ্ধ শিল্পাকারে পরিণত হইয়া উঠে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে কবি এক পত্রে লিখিতেছেন—

“চিত্তরঞ্জনের কাছে শুনলুম তুমি রীতিমত 'Varsity man হয়ে গেছ। ভার্সিটি ম্যানের কি কি লক্ষণ জানি নে কিন্তু শব্দটা শুন্‌লেই আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়-বিমুখ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়।”[৪২]

পাণ্ডিত্যের যে সাধারণ লক্ষণ আমরা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহার মধ্যে অখণ্ড বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার প্রবণতাই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে দেখা যায়। এই শুষ্ক তার্কিকতা বা scholasticism, যাহা বস্তুর সমগ্র রূপটির যথাযথ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক না হইয়া বাধক হইয়া দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাথের মনে চিরকালই সে সম্বন্ধে একটা বিভীষিকা ছিল। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' কবি এক জায়গায় লিখিতেছেন—

“আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই

জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।"[৪৩]

কবি শিলাইদহ-বাসের নিভৃত দিনগুলিতে যে বিচিত্র বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অখণ্ড দৃষ্টি তো আচ্ছন্ন হয়ই নাই, পরন্তু মানসলোক বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই তপস্যালব্ধ জ্ঞানসম্ভার তাঁহার মনের কোন্ অবচেতন গুহায় যে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিত, এবং কখন যে কোন্ অবসরে কোন্ অজ্ঞাত কারণে চেতনার স্তরে উন্মগ্ন হইয়া বিচিত্র বাণীর আকারে জন্মলাভ করিত, তাহা কবির নিকটও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যই ছিল। তাই দেখি, এক জায়গায় কবি বলিতেছেন—

"ছেলেবেলা হতেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগির মত অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মী-ছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন-কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না, তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।

"যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না বলে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনো দিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ করে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধিনি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলেমেশে। . এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গ মূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি।"[৪৪]

শিলাইদহ-যুগে কবির এই অতন্দ্র জ্ঞানসাধনা যেমন তাঁহার মননশীলতাকে সমৃদ্ধ

করিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নিছক ভাবালুতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া রস ও ভাবের (idea and emotion) অপূর্ব সমন্বয় সঞ্জাত এক বিচিত্র দিব্য সৌরভ সঞ্চার করিয়া তাহাকে চিরকালীন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রচলিত সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে—লেখক ও পাঠক, স্রষ্টা ও রসয়িতা, এই উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই মননশীলতার প্রতি গভীর অনাসক্তি ও বৈমুখ্য কবিকে চিরকালই অত্যন্ত পীড়িত করিত। তাই দেখিতে পাই, 'সবুজ পত্র'-পর্বে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত এক পত্রে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"আমাদের দেশের পনেরো আনা লেখার মধ্যে মন জিনিষটা নেই— আমাদের পাঠকদের পাকযন্ত্র সেই জন্যে ওটা এখনও হজম করতে শেখে নি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্তেজনা যতই জোগাবে তার অফুরান কাট্‌তি। কিন্তু মন জিনিষটা বড় বালাই। ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই অমনি গলে না। ওটার সঙ্গে কারবার করতে হলে যে পরিণতির দরকার, যে কারণেই হোক, আমাদের দেশে সেটা দুর্লভ হয়েচে। আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাই নি— যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেছে সেই 'আমার জন্মভূমি'তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদেয় বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয়, নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়— এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্‌টেভ্‌স্কি বার্নার্ড শ কোট্‌ করে এবং ব্যাখ্যা করেই স্কুলমাস্টারি করতে পার তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্ছে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর— এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চলবে না। অক্ষয় মজুমদার বলতেন 'অভিনয় করবার সময় দর্শকদের মনে করতুম বাঁদর, তাতেই অভিনয় করা সহজ হত।' কিন্তু অভিনয়ের বেলা যেটা খাটে সাহিত্যের বেলা সেটা খাটে না। সাহিত্যের বেলা মনে রাখতেই হবে যাদের জন্যে লিখচি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই মন আছে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সেই মনের যাচাইটা খাঁটি এবং কড়া নয় বলেই কতই যে বাজে লেখা লিখেচি তার ঠিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে নেবার লোকটি না থাকলে

ভিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে। কিন্তু এসমস্ত মেনেও কোমর বেঁধে চলতে হবে এবং জানতে হবে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবিত্বের সহিত মনীষার এমনই মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটিয়াছিল যে, ইহার ফলে একদিকে তাঁহার কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যকর্ম যেমন ক্ষণজীবী সাময়িক সাহিত্যের স্তর হইতে উন্নীত হইয়া চিরকালের বিদগ্ধ সমাজের উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তাঁহার বিশুদ্ধ মননাত্মক রচনারাজিও— যেমন, 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলী, 'মানুষের ধর্ম', বাংলা ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সংক্রান্ত অসংখ্য নিবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি — তেমনই প্রসাদগুণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে; পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে কী গভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষা উহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তাঁহার তরুণ বয়সের এই অনলস ও বহুধাবিসারী বিচিত্র সাহিত্যসাধনার কথা জানাইয়া বলিতেছেন—

"এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে তো নেহাৎ সৌখীন চালে করিনি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈরোঁ থেকে শুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢাল সড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়ি নি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা এ কথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজাড় করতে হয়, এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপুরি লাগতে হবে।"[৪৬]

কবির এই আত্মঘোষণা যে কত সত্য, তাঁহার সুবিশাল সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু সেই সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরালে কবির যে বিরামহীন প্রস্তুতির ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে, 'ছিন্নপত্রে'র খণ্ডিত পত্রাবলী সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিবার পক্ষে পরম সহায়, ইহা প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকই স্বীকার করিবেন।

১ পুত্র রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে কবির আশীর্বাণী হইতে উদ্‌ধৃত।

২ ছিন্নপত্র. পত্রসংখ্যা ৮। রচনাকাল ২৭ জুলাই ১৮৮৭। তুলনীয়: ". . চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটুকু বছর বৃথা নষ্ট করলুম—". . ভানুসিংহের পত্রাবলী,

পত্র° ৪২ [৭ই আশ্বিন ১৩২৮]। অপিচ—"ভানুসিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।"— ঐ. পাদটীকা।

৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৪ (শিলাইদহ, ২৪ জুন ১৮৯৪)।

৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০ (শিলাইদহ ১৮৮৮)।

৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ২৬ (সাজাদপুর ২২ জুন ১৮৯১)।

৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৭ (শিলাইদহ, ৩০ জুন ১৮৯৪)। তুলনীয় : পত্রসংখ্যা ১১২ (শিলাইদহ ৮ অগস্ট্ ১৮৯৪)।— "একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি, থেকে থেকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়, আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্ছে।. . ." অপিচ, তু° ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৩২ (শিলাইদহ ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪)।

৭ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৯২ (সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩)। তু° "আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেছি—কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেছে— সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।"— ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর নিকট কবির পত্র। দ্র° চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ৩৫ (শান্তিনিকেতন, ৭ মার্চ ১৯৩১)। অপিচ, দ্র° চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ৪, পৃ. ৩১।

৮ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭৯। শিলাইদহ, মে ১৮৯৩। তুলনীয় : "আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে।" — চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৪ (কলকাতা, ১৬ জুন, ১৮৯৪), প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র।

৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০।

১০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪৪ (শিলাইদহ, ৮ এপ্রিল ১৮৯২)।

১১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭৪। তুলনীয়—"বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টি, দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্ণে সেইটি খুব করে পড়া গেছে -- কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।"— চিঠিপত্র ৫, পত্র°৪ [প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র। রচনা-কাল ১৮৯০ (?)]।

১২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫২ (শিলাইদহ বুধবার। ২ আষাঢ় ১২৯৯)।

১৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৭১ (পুরী, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩)

১৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫ (বোয়ালিয়া, ১৮ নভেম্বর ১৮৯২)।

১৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫৯ (সাজাদপুর, ২৯ জুন ১৮৯২)।

১৬ দ্র° চিঠিপত্র ৬, পত্র° ১৯ [এপ্রিল ১৯০২]।

১৭ তু° "বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে ; ভালো লাগা আর ভালো বাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটো পারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে

যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের তৃপ্তির দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।"
— পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি : যাত্রী, পৃ. ১২৮-১২৯।

১৮ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪৪। (৮ এপ্রিল ১৮৯২)।

১৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪৮। বোলপুর। মঙ্গলবার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২।

২০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১৮। কুষ্টিয়ার পথে। ২৪ অগষ্ট্ ১৮৯৪।

২১ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ১২ক সাজাদপুর। ৮ শ্রাবণ [১৮৯৩]

২২ দ্র° বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪২-৫০। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৩৫৯)। উদ্‌ধৃত পত্রেই *Amiel's Journal*-এর যে অংশ কবি উল্লেখ করিয়াছেন, বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদ-টীকারূপে তাহাও বিস্তারিতভাবে উদ্‌ধৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩০০)।

২৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০০। পতিসর. ২২ মার্চ্ ১৮৯৪।

২৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১৭। শিলাইদহ ১৬ অগস্ট্ ১৮৮৪।

২৫ প্রকাশকাল ১৮৮২।

২৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮৮। শিলাইদহ, ৪ জুলাই ১৮৯৩।

২৭ চিঠিপত্র ৫. পত্র° ৩৪। [New Haven. ২৫ অক্টোবর ১৯৩০].

২৮ চিঠিপত্র ৬, পত্র° ৮।

২৯ শেষের কবিতা § ১৩ : 'আশঙ্কা'।

৩০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৪২। (কলকাতা ৯ এপ্রিল ১৮৯৫)।

৩১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১২৭। (বোলপুর। ১৯ অক্টোবর ১৮৯৪)।

৩২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৩৮। (শিলাইদহ ১৬ ফাল্গুন ১৮৯৫)। Edward Dowden রচিত *Life of Shelley* প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে।

৩৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০ (পতিসর, ২২ মার্চ ১৮৯৪)। দ্র° বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধ।

৩৪ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১০১ (১৭ মাঘ ১৮৯১)।
তু° "আর একটু বড় হলে আমরা গুরুজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকগুলি ইংরেজ লেখকের বই সমাদে পড়ে উপভোগ করেছি। Marie Bashkirt-cheff-এর জার্নাল আর এমিয়েলের জার্নাল বোধ হয় তার মধ্যে ছিল"—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী : রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ. ৪৫। দ্র° "Bashkirtscheff, Marie (1860-84), a Russian diarist, whose 'Journal', written in French and published posthumously in 1887, attained a great vogue by its morbid introspection and literary quality, and was translated in several languages (Eng. translation, 1890, by Mathilde Blind)."—*The Oxford Companion to English Literature*, 3rd Edn., 1946, p. 67.

৩৫ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৩৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৫০। (কুষ্টিয়া, ৫ অক্টোবর ১৮৯৫)।

৩৭ চিঠিপত্র ৬, পত্র° ৪। (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০। শিলাইদহ)।

৩৮ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ৫৯ (শান্তি° বোলপুর, ২৩ অক্টোবর, ১৯১৭), পৃ. ২২৪-২২৬।

৩৯ চিঠিপত্র ৫ পত্র° ৮৩[ক]—তারিখ নাই। অপিচ তু°—"সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্বগামীর বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে। ইতি ভাদ্র তারিখ জানি নে, ১৩১৫।'—ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর নি লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° চিঠিপত্র ২।

৪০ দ্র° চিঠিপত্র ৫।

৪১ চিঠিপত্র ৫, পত্র° ৬২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনে মনে অনুরূপ আক্ষেপ বহন করিতেন। তু "বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্‌তে বল্‌তে সত্য স কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কে তা হ'লো! সংসারে পড়ে কি সময় পেলাম না'।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত. ৩য় ভাগ।

৪২ চিঠিপত্র. ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪। [পত্র° ১৪ কলকাতা, ১৬ জুন ১৮৯৪]।

৪৩ 'জাভাযাত্রীর পত্র. ৪' : 'যাত্রী', পৃ. ২০২।

৪৪ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি : যাত্রী, পৃ. ১১০-১১১।

৪৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৭ (ফাল্গুন ১৩২৪)।

৪৬ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫২ (শান্তিনিকেতন ১৩ এপ্রিল, ১৯১৭)।

বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ ॥

পরিশিষ্ট

কালিদাসের উপমা*

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে অনেক বড় বড় কবি জন্মিয়াছেন বটে—কিন্তু বাল্মীকি ও বেদব্যাস ঋষিকবিদ্বয়কে বাদ দিলে প্রথমেই কালিদাসের নাম মনে পড়ে। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্ঠিকাঽধিষ্ঠিতকালিদাসা।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সাঽর্থবতী বভূব॥

অনামিকা অঙ্গুলির নাম আজ সার্থক! কেননা, যখন কবিগণের নাম গণনার কথা হইল, তখন প্রথমে কনিষ্ঠিকা অঙ্গুলীতে কালিদাসের নাম গণনা করিয়াই থামিয়া যাইতে হইল, দ্বিতীয় অঙ্গুলীতে গণনা করিবার মত আর কোনও সদৃশ কবির নাম পাওয়া গেল না। সেইজন্যই কনিষ্ঠিকার পরবর্তী অঙ্গুলীর নাম হইল 'অনামিকা'—সার্থক বটে!

প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব এক একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। কালিদাসের বৈশিষ্ট্য কিসে? আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের মতে—উপমাপ্রয়োগে। উপমা ত' সকল কবিই প্রয়োগ করিয়া থাকেন,—ভারবিও উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, মাঘকবিও করিয়াছেন, ভবভূতি, ভাস, অশ্বঘোষ সকলেই উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের উপমার এত প্রসিদ্ধি কেন? কালিদাসের কাব্যের সুর যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রবণমাত্রেই বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ উপমাটি কালিদাসের, কোন্‌টি তাঁহার নয়। কালিদাসের উপমার সঙ্গে অন্যান্য কবির উপমার এতই প্রভেদ! কালিদাসের উপমার এই অনন্যসাধারণতার কারণ কি? সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কালিদাসের উপমার মধ্যে এমন এক সাবলীলতা, এমন এক লালিত্য, এমন এক ঔচিত্য আছে, যাহা অন্যান্য কবির কাব্যে দুর্লভ। হয়ত একই উপমা উভয়েই প্রয়োগ করিয়াছেন,—কিন্তু কালিদাসের লেখনীতে তাহা এক অপূর্ব্ব রমণীয়তা ধারণ করে।

রসের উপযোগী করিয়া উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার কাব্যে নিবেশ করিতে হইবে, তবেই তাহাদের চমৎকারিতা। রসবিরোধী হইলে অলঙ্কারের কোনও চমৎকারিতাই নাই। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের নির্দ্দেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন।
কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্ব্বহণৈষিতা॥
নির্ব্যূঢ়াবপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্।

রূপকাদেরলঙ্কারবর্গস্যাঙ্গত্বসাধনম্ ॥—ধ্বন্যালোক, উদ্দ্যোত ২।

কালিদাস তাঁহার কাব্যে উপমা যেন অজস্রভাবে ছড়াইয়াছেন—কিন্তু কোনটিই অনাবশ্যক নহে। উপমার পর উপমা, শ্লোকের পর শ্লোক উপমার দ্বারা সমৃদ্ধ। সত্যই অভিনবগুপ্তের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"মহাকবিবাচোঽস্যাঃ কামধেনুত্বাৎ।" —"মহাকবিবাক্য কামধেনুস্বরূপ।"

কালিদাস তাঁহার বিভিন্ন কাব্য এবং নাটকে কত বিচিত্র উপমার সমাবেশ করিয়াছেন! এই বিপুল বিশ্বের কোন্ কোন্ বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে মহাকবি তাঁহার উপমান-সামগ্রী নির্ব্বাচন করিয়াছেন—এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত মহাকবির বিভিন্ন রচনা সমগ্রভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া তাঁহার উপমাসম্ভারের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিবার কোনও উপায় ছিল না। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় কবিগণের কাব্যের বিভিন্ন দিক্ লইয়া বিশেষ বিশেষ সূচীগ্রন্থ (Concordance) রচিত হইয়াছে। এক শেক্স্পীয়রের কাব্য ও নাটক অবলম্বন করিয়া 'অনুক্রমণিকা' জাতীয় অসংখ্য গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। ফলে সেই সেই কবিগণের কাব্যের সূক্ষ্ম আলোচনার অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের রচনার কোনও শব্দানুক্রমণী বা বিষয়ানুক্রমণী বা অলঙ্কারানুক্রমণী ইত্যাদি সংকলনেও কোনও গবেষক এ পর্য্যন্ত ব্রতী হন নাই। শ্রীযুক্ত পিল্লাই সংকলিত '*Similes of Kalidasa*' শীর্ষক গ্রন্থটি কালিদাসের কাব্যালোচনার বিষয়ে আংশিক অভাব পূরণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই-জাতীয় সংকলন-গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কতকগুলি মূল সূত্র (principles) নির্ধারণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন—কেন না, সেই সকল সূত্র অনুযায়ীই সংকলন কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কালিদাস-কাব্যের উপমাসংকলনই যখন এক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন 'উপমা' বলিতে কাহাকে বুঝিব, সে বিষয়ে প্রথম হইতেই একটি স্থির সিদ্ধান্ত গড়িয়া লইতে হয়। কালিদাস তাঁহার কাব্যে শুধু উপমাই প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে, যতকিছু অর্থালঙ্কার সম্ভব হইতে পারে, প্রায় সব কিছুরই উদাহরণ কালিদাসের রচনার মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহাদের মধ্যে কোন্, কোন্ অলঙ্কার উপমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, কোন্গুলিকে উপমার গণ্ডী হইতে বাদ দিতে হইবে, এবং ইহার কারণই বা কি—তাহা প্রারম্ভেই নির্দেশ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত পিল্লাই তাঁহার ভূমিকায় অপ্পয্য দীক্ষিতের নিম্নলিখিত কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

উপমৈকা শৈলূষী সম্প্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান্।
রঞ্জয়তি কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥

'উপমা'ই নটীর মত বিভিন্ন অলঙ্কারের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে বটে। কিন্তু উপমা এবং সাধর্ম্যমূলক অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে প্রভেদও আছে— কেননা, উভয়ের স্থলে আমাদের প্রতীতি বিভিন্ন প্রকারের জন্মিয়া থাকে। শুদ্ধ 'উপমা' এবং সাধর্ম্যমূলক 'ভ্রান্তিমান্' একই অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য থাকিলেও একটিতে স্ফুট সাধর্ম্য, অপরটিতে উহা অস্ফুট বা গম্য (implied)। সেইজন্য অলঙ্কারসর্বস্বকার রুয্যক তাঁহার উপমালক্ষণের আলোচনায় ("উপমানোপমেয়য়োঃ সাধর্ম্যে ভেদাভেদতুল্যত্বে উপমা"—অ° স° § ১১) সাধর্ম্যের similarity-র তিন প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"[অর্থালঙ্কারপ্রকরণমিদম্। উপমানোপমেয়য়োরিত্যপ্রতীতোপমানোপমেয়-নিষেধার্থম্]

সাধর্ম্যে ত্রয়ঃ প্রকারাঃ। ভেদপ্রাধান্যং ব্যতিরেকবৎ। অভেদপ্রাধান্যং রূপকবৎ।
দ্বয়োস্তুল্যত্বং যথাঽস্যাম্। যদাহুঃ— কিঞ্চিৎ সামান্যং কশ্চিচ্চ বিশেষঃ,
স বিষয়ঃ সদৃশতায়াঃ—ইতি। উপমৈব চ প্রকারবৈচিত্র্যেণ অনেকালঙ্কারবীজ-ভূতেতি প্রথমং নির্দিষ্টা।"—অলঙ্কারসর্বস্ব, পৃ. ২২ (ত্রিবান্দ্রম্ সংস্করণ)।

সুতরাং 'সাধর্ম্য' (similarity) ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে— (১) সাধর্ম্য থাকিলেও ভেদই প্রধানরূপে প্রতীত হইতে পারে ; (২) সাধর্ম্য হইতে অভেদ (identity)-ই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে ; (৩) কিংবা দুইটি বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই তুল্যভাবে বিবক্ষিত হয় ; তখনই শুদ্ধ সাধর্ম্য— তাহাই উপমার ভিত্তি। রুয্যকের এই শৈলী অনুসরণ করিয়া আমরা সাধর্ম্যমূলক অলঙ্কারগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি।

(১) অভেদপ্রধানসাধর্ম্যমূলক— রূপক, পরিণাম, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্, উল্লেখ, অপহ্নুতি।

(২) ভেদপ্রধানসাধর্ম্যমূলক— দীপক, তুল্যযোগিতা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, প্রতি-বস্তূপমা, সহোক্তি, প্রতীপ, ব্যতিরেক।

(৩) ভেদাভেদসাধারণসাধর্ম্যমূলক— উপমা, অনন্বয়, উপমেয়োপমা, স্মরণ।

ভেদপ্রাধান্য বা অভেদপ্রাধান্য কোনও কিছু বিচার না করিয়াই যদি সামান্যভাবে সাধর্ম্যমূলক সমস্ত অলঙ্কারকেই 'উপমা'র মধ্যে পরিগণন করা অভিপ্রেত হয়,

তবে আলোচনার সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য উপরি নির্দিষ্ট ত্রিবিধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক অলঙ্কার তুল্য যুক্তি অনুসারে 'উপমা'রূপে গণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু এই স্থলে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে ধ্বনিকার প্রভৃতি প্রধান প্রধান আলঙ্কারিকগণ দীপক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলঙ্কারের স্থলে গম্য (implied) সাধর্ম্যের প্রতীতি স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার চারুত্ব স্বীকার করেন নাই—

"যথা চ দীপকাপহ্নুত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যত্বেন উপমায়াঃ প্রতীতৌ অপি প্রাধান্যেন অবিবক্ষিতত্বাৎ ন তয়া ব্যপদেশঃ . . .।"[১]— ধ্বন্যালোক ১ম উদ্দ্যোত, পৃঃ ১১৬-১৭ (কাশী সংস্করণ)।

উৎপ্রেক্ষা এবং অতিশয়োক্তি— এই দুই অলঙ্কার, সাদৃশ্যগর্ভ হইলেও 'অধ্যবসায়' অংশটুকুই এই দুইটি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যের মূল। উৎপ্রেক্ষা স্থলে উপমার মত 'ইব' শব্দের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়— সুতরাং উৎপ্রেক্ষার উদাহরণকে 'উপমা' বলিয়া মনে করা স্থূলদর্শীর স্বাভাবিক ভ্রম। দণ্ডী এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং এই ভ্রমের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

কেষাঞ্চিদুপমাভ্রান্তিরিবশ্রুত্যেহ জায়তে ॥—কাব্যাদর্শ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উৎপ্রেক্ষা, ঊহ, তর্ক, অধ্যবসায়, নিগরণ, ইত্যাদি শব্দ সমানার্থক (synonymous)। জয়রথ তাঁহার 'অলঙ্কারসর্বস্বে'র 'বিমর্শিনী' টীকায় 'উৎপ্রেক্ষা' বা 'তর্কে'র স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন— "তর্কঃ সংশয়াৎ প্রচ্যুতঃ, নির্ণয়ং চাপ্রাপ্তঃ"। যাহা সংশয়াত্মকও নহে, অথচ নিশ্চয়াত্মকও নহে, ত্রিশঙ্কুর মত যাহা সংশয় ও নিশ্চয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানকে তর্ক বা উৎপ্রেক্ষা বলা হয়— এবং এইরূপ জ্ঞানই 'উৎপ্রেক্ষা' অলঙ্কারের মূলে। আমরা যখন বলি— 'মুখটি যেন চাঁদ', (মুখং চন্দ্র ইব)— তখন 'যেন' ('ইব') শব্দটি সংশয় ('এটি কি মুখ অথবা চাঁদ'?) ও বুঝায় না, আবার নিশ্চয় ('মুখটি চাঁদই') ও বুঝায় না। কিন্তু সংশয় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের জ্ঞান মুখ এবং চন্দ্রের অভেদ-নিশ্চয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে মাত্র, এখনও সম্পূর্ণ অভেদ নিশ্চিত হয় নাই— এইরূপ বোধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য বিষয় (মুখ) এবং বিষয়ী (চন্দ্র) এই উভয়ের অভেদ যেখানে নিশ্চিত হইতে কিছু বাকী আছে, কিন্তু আমাদের প্রতীতি যেখানে সেই অভেদ নিশ্চয়ের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, সেইরূপ এক 'ব্যাপার' (movement, process) 'উৎপ্রেক্ষা' অলঙ্কারের মূল লক্ষণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপ্রেক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য বোধ নিহিত থাকিলেও তাহা সেই অভেদ নিশ্চয়াভিমুখী ব্যাপারের (যাহাকে, ঊহ, তর্ক, অধ্যবসায় প্রভৃতি শব্দের

দ্বারা আলঙ্কারিকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন) প্রতি গৌণ (subsidiary)। অতএব সাদৃশ্যবোধের সেই ক্ষেত্রে কোন চমৎকারিতাই নাই। সুতরাং উৎপ্রেক্ষাকে ঔপম্যমূলক অলঙ্কারের গণ্ডী হইতে বাদ দেওয়াই সমীচীন, এবং প্রত্যেক আলঙ্কারিকই এ'বিষয়ে একমত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে 'অলঙ্কারসর্বস্ব'কারের মতানুযায়ী সাধর্ম্যমূলক অলঙ্কারের যে তিনটি শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী (অর্থাৎ ভেদাভেদসাধারণসাধর্ম্যমূলক)-র অন্তর্গত অলঙ্কারগুলিকেই মুখ্যভাবে উপমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। তবে গম্য সাধর্ম্য (implied similarity)-ও যদি উপমার লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অলঙ্কারগুলিকে উপমার গণ্ডীর মধ্যে গণনা করা চলিতে পারে। কিন্তু শ্রীযুক্ত পিল্লাই-এর এই অনুক্রমণিকাগ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তিনি এই দুইটি বিকল্পের (alternatives) কোনটিকেই একান্তভাবে আদ্যোপান্ত গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং অলঙ্কারনির্বাচনে সামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।—

[১] "রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্॥"—(রঘু° ৪. ২)

এই শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্দ্ধে আলঙ্কারিকগণের মতে 'উপমেয়োপমা'[২] অলঙ্কার হইয়াছে। ইহা রুয্যকোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত মুখ্যসাধর্ম্যমূলক অলঙ্কার। অথচ শ্রীযুক্ত পিল্লাই সংকলিত অনুক্রমণীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না।

[২] "আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগান্মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ॥"—রঘু° ১৩. ২৯।

মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকটিতে 'স্মরণ' অলঙ্কার।[৩] শ্রীযুক্ত পিল্লাই-এর অনুক্রমণীতে এটি স্থান পাইয়াছে (দ্রষ্টব্যঃ কন্দল. ১২৮)। সেইরূপ 'প্রেক্ষ্যোপান্ত-স্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি' (মেঘদূত ২.১৭)—এই শ্লোকটি স্মরণালঙ্কারের উদাহরণ হইলেও[৪] সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রঘুবংশের নিম্নলিখিত শ্লোকটি—

"অপি তুরগসমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং
ন স রুচিরকলাপো বাণলক্ষীচকার।
সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে
রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে সুকেশ্যাঃ॥"—রঘু° ৯.৬৭

স্মরণালঙ্কারের উদাহরণ হইলেও অনুক্রমণীতে স্থান পায় নাই।

[৩] 'সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্' (১৩১. ৮), 'রবিপীতজলা তপাত্যয়ে পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী' (৩৩৮). 'বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে' (৬০৯)—ইত্যাদি 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের বহু উদাহরণ অনুক্রমণীতে সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু রঘুবংশের 'কৃষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধো বীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোতি' (রঘু ৯), 'অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফমালা সবিশেষসংজ্ঞা' (কুমার° ১) 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্' (কুমার° ২), 'প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি' (অ° শ° ৫) ইত্যাদি দৃষ্টান্তালঙ্কারের বহু প্রসিদ্ধ উদাহরণের কোনও উল্লেখ বর্তমান অনুক্রমণীতে দেখিলাম না।

[৪] 'কমলশ্রিয়ং দধৌ' (১৩১.২), 'তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্' (৯৬), 'প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যাঃ। তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ' (৫২৭) ইত্যাদি 'নিদর্শনা'র উদাহরণ সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু 'আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্' প্রভৃতি 'নিদর্শনা' সংগৃহীত হয় নাই।

এইরূপ সাদৃশ্যমূলক অন্যান্য অলঙ্কার নির্বাচনেও সংকলয়িতা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিস্তরভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

অলঙ্কারনির্বাচনের পর, দ্বিতীয় কর্তব্য হইল বর্গীকরণ বা classification। একটি উপমাকে কিভাবে সাজাইব, কি পদ্ধতি অনুসরণ করিব? একটি সহজ উদাহরণ লওয়া যাউক। 'চন্দ্র ইব মুখম্' এই উপমাটিকে কোথায় অন্তর্ভুক্ত করিব? সংকলয়িতা (যতদূর বুঝিলাম, যদিও তিনি স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই) 'উপমানবাচক' শব্দটিকে ভিত্তি করিয়াই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কলিদাসের কোনও উপমা বর্তমান অনুক্রমণীতে কোন্ শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে জানিতে হইলে, সেই উপমাটির অন্তর্ভুক্ত উপমানবাচক পদটির অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু কোনও একটি উপমাতে কোন্ পদটি প্রধানভাবে 'উপমান'-রূপে বিবক্ষিত—ইহা বুঝিব কিরূপে? আলঙ্কারিকগণ এ'বিষয়ে একটি সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। মম্মট বলিয়াছেন—

"যথেবাদিশব্দা যৎপরাঃ তস্যৈব উপমানতাপ্রতীতিরিতি"—কাব্যপ্রকাশ, ১০ম উল্লাস। সাধারণতঃ, যে শব্দের পরে 'ইব' প্রভৃতি সাধর্ম্যবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই 'উপমানবাচক' শব্দরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং

'চন্দ্র ইব মুখম্' এস্থলে 'চন্দ্র' পদটিই উপমানবাচক। শ্রীযুক্ত পিল্লাই মোটামুটি এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া নির্বাচিত অলঙ্কারগুলির শ্রেণীকরণ করিলেও, বহুস্থলে, অনেকটা অনবধানতাবশতঃই ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। ফলে শ্রেণীকরণবিষয়েও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যেমন, শ্রীযুক্ত পিল্লাই—'একং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্' (৮৯.২) মেঘদূতের এই উপমাটিতে 'ইন্দ্রনীল' শব্দটিকে উপমানবাচক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া এই উদাহরণটীকে তাহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে 'মুক্তাগুণ'ই এখানে উপমান, 'স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্' পদটি তাহারই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার 'ক্বচিচ্ছ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য' (৯২.২) এখানেও 'তনু' শব্দটি উপমানবাচক শব্দ, কেননা, 'ইব' শব্দের সহিত তাহারই অব্যবহিত ভাবে অন্বয় হইতেছে। কিন্তু সংকলয়িতা 'তনুঃ' শব্দের বিশেষণ 'ঈশ্বরস্য' পদটিকে উপমানশব্দরূপে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী উদাহরণ-টির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। সেইরূপ—'নভসা নিভৃতেন্দুনা-তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ' (৪৯.২)—এখানেও সেই একই ভ্রম! 'নভস্' শব্দটিই এখানে মুখ্য উপমানবাচক শব্দ। কিন্তু সংকলয়িতা 'উদিতার্কেণ' এই বিশেষণ শব্দটিকে উপমানপদ মনে করিয়া তদনুসারে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় অসামঞ্জস্যের উদাহরণ অনুক্রমণী হইতে আরও উদ্ধার করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে করিলাম না!

ঐসকল ত্রুটি সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত পিল্লাই-এর এই প্রচেষ্টার সার্থকতা আছে। কালিদাসের প্রতিভার ব্যাপকতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। কীট, পতঙ্গ, মৃগ, পক্ষী, জলচর, মনুষ্য, দেবলোক, জ্যোতির্লোক, বৈদ্যকশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বিভিন্ন শিল্প ও কলা, এই বিশাল প্রকৃতির সকল কক্ষা কালিদাসের কবিদৃষ্টির সম্মুখে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কালিদাস ঐ সমস্ত কিছু হইতেই তাঁহার উপমার সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন। সত্যই ভামহের উক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা বলিতে পারি—

ন তচ্ছিল্পং ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ ॥

এই প্রসঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ অনুক্রমণীকার মহাকবি শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, কালিদাস সম্বন্ধেও আমরা সেই একই কথা বলিতে পারি—

"Shakespeare, the most frequently quoted, because the most universal-minded Genius that ever lived, of all Authors, best

deserves a Complete Concordance to his works. To what subject may we not with felicity apply a motto from this greatest of Poets? The Divine,·· the Astronomer,·· the Naturalist,···the Botanist,···the Philosopher,···the Lover,···the Lawyer,···the Musician,·· the Painter,···the Novelwriter,···the Orator,···the Soldier,···or the Humanist···,— may all equally adorn their page or emblazon their speech with gems from Shakespeare's works."[৭]

আশা করি, শ্রীযুক্ত পিল্লাই-এর এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য সংস্কৃতসেবী সহৃদয়গণ এই জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় মহাকবিগণের কাব্যালোচনার পথ সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ, উভয়বিধ পাঠকের পক্ষেই সুগম করিয়া দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন।

*উপমা কালিদাসস্য : *Similes of Kalidasa*—by K. Chellappan Pillai (Visva-Bharati Studies, 1945).

১ ইহার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"দীপকে হি 'আদিমধ্যান্তবিষয়ং ত্রিধা দীপকমিষ্যতে' (ভামহ, ২. ২৫) ইতি লক্ষণম্। অত্র দীপনকৃতমেব চারুত্বম্। 'অপহ্নুতিরভীষ্টস্য কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা' (ভামহ, ৩. ২১) ইতি। তত্র অপহ্নুত্যৈব শোভা।"—লোচনব্যাখ্যাঃ পৃ, ১১৬-১৭।

২ 'পর্য্যায়েণ দ্বয়োরেতদুপমেয়োপমা মতা'—সাহিত্যদর্পণ, ১০।

৩ 'সাদৃশ্যাৎ স্মরামীতি শেষঃ'—মল্লিনাথ। তুলনীয়— "সদৃশানুভবাদ্ বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে।'—সা দ. ১০।

৪ 'অতএবাত্র স্মরণাখ্যোঽলঙ্কার'—মল্লিনাথ।

৫ তুলনীয় : "ভক্তিনৈরন্তর্য্যেণাপ্যন্যেষাং গতিঃ সমা। জ্ঞেয়েত্থমেবমাদীনাং তজ্জাতীয়ার্থবাচিনাম্। যতস্তে চাদয় ইব শ্রূয়ন্তে যদনন্তরম্। তদর্থমেবাবচ্ছিন্দ্যুপমানমতোঽন্যথা।'—ব্যক্তিবিবেক।

৬ অবশ্য, ইহা লক্ষণীয় যে, শ্লোকে বহুস্থলে 'ইব' প্রভৃতি সাধর্ম্যবাচক শব্দ উপমানবাচক শব্দের অব্যবহিত পরেই বিভিন্নকারণে (ছন্দোরক্ষা প্রভৃতি) প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেইস্থলে অন্বয়ের পর কবির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া উপমানবাচকপদ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। যেমন 'গাংগতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ'।

৭ Mrs. Cowden Clarke: *The Complete Concordance to Shakspere* Preface, p. v. (London, W. Kent & Co., 1870).

আলেখ্য দর্শন*

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যখানি সহৃদয় সমাজকে চিরদিন মাতাইয়াছে। ইহার আকর্ষণ শাশ্বত ও চিরনবীন। এই অনবদ্য শিল্প কর্মটির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিবার কত বিচিত্র প্রয়াসই না এপর্যন্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞগণের অধুনাতন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে গুপ্তসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস প্রভুর নির্দেশে দাক্ষিণাত্যের বাকাটক রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সভায় কিছুকাল যাবৎ বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তদুহিতা প্রভাবতী গুপ্তার পরিণয় ঐতিহাসিকগণের এই সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার অনুকূল। গুপ্ত রাজকুলের সহিত বাকাটক বংশের এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে হয়ত' মহাকবিকে একাধিকবার আপন জন্মভূমি পশ্চিম মালবের মন্দদশপুর (মন্দশোর) হইতে উজ্জয়িনীর পথ হইয়া নর্মদপারবর্তী বাকাটক রাজ্যের রাজধানী নন্দিবর্ধন পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করিতে হইয়াছে। সুতরাং নন্দিবর্ধনের নাতিদূরবর্তী পুণ্যক্ষেত্র রামগিরি হইতে বেত্রবতী তীরবর্তী-বিদিশা পর্যন্ত ভূভাগের সহিত মহাকবির ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। তাই দেখিতে পাই, মেঘদূতে রামগিরি হইতে বিদিশা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের বর্ণনা কতখানি বাস্তবধর্মী। এই পথে যে সকল স্বল্পতোয়া নদী পড়িয়াছে, কালিদাস যেন তাহাদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়াছেন। রেবা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, শিপ্রা, গন্ধবতী, চর্মণ্বতী, সরস্বতী, জাহ্নবী—শুধুই কল্পনানেত্রে নহে, মহাকবি হয়ত' সশরীরে ইহাদের তীরে বিচরণ করিয়াছেন, ইহাদের স্রোতে অবগাহন করিয়াছেন। তাই তাঁহার অমর কাব্যখণ্ডে ইহাদেরও অমরত্ব দান করিয়া ধন্য করিয়াছেন। মেঘদূতে মেঘের যাত্রাপথে এই সকল স্রোতস্বিনী কি অপরূপ বর্ণেই না মহাকবিকর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে। উত্তরমেঘে যক্ষপত্নী যেমন অদৃশ্যা নেপথ্যনায়িকা, পূর্বমেঘে এই সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্রোতস্বিনী সেইরূপ শরীরিণী উপনায়িকা। দূতরূপী মেঘ এই সকল নদীনায়িকার সহিত ক্ষণসঙ্গসুখ অনুভব করিতে করিতে অলকা-অভিমুখে মন্থরগতিতে চলিয়াছে। পরিশেষে উত্তীর্ণ হইয়াছে অলকাপুরীতে গিয়া। অলকাপুরীও যেন আর একটি নায়িকা—উত্তরমেঘে কালিদাস এই অভিনব নায়িকা এবং যক্ষপত্নী—এই দুইএর অনুপম চিত্র আঁকিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র মেঘদূতখানি একটি অপূর্ব আলেখ্যভবন। বলেন্দ্রনাথ তাঁহার 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে বহু পূর্বেই একথা

বলিয়াছিলেন— "মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। ……কেবলি চিত্র— ছবির পর ছবি।" সুশীল রায় মহাশয় তাঁহার 'আলেখ্য দর্শন' প্রবন্ধে কালিদাসের সেই আলেখ্যভবনের মধ্যে সাধারণ পাঠক সমাজের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা শুধুই নিশ্চল জড়প্রকৃতির চিত্র নয়। তাঁহার দৃষ্টিতে পূর্বমেঘের নদী শুধু নদীই নহে, উত্তরমেঘের অলকা শুধু অলকাই নহে। তাঁহার কাছে রেবা পিপাসাময়ী, বেত্রবতী গুণান্বিতা, নির্বিন্ধ্যা রমণীয়া, শিপ্রা উপেক্ষিতা, গন্ধবতী সুচতুরা, গম্ভীরা শফরীলোচনা, চর্মণ্বতী কুণ্ঠাকাতরা, সরস্বতী নিক্কণময়ী, জাহ্নবী হাস্যোৎফুল্লা। আবার, অলকা কখনও স্বয়ম্বরা, কখনও আত্মহারা, কখনও হ্রীমূঢ়া, কখনও খণ্ডিতা, কখনও বা রুদ্ধশ্বা। 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং' সন্নিপাতরূপী মেঘও লেখকের দৃষ্টিতে বিচ্ছেদবেদনাতুর চেতনপদার্থরূপে আভাত হইয়াছেন। আমরা যক্ষের ও যক্ষপ্রিয়ার বিরহ-বেদনায় এতই কাতর হই যে, দূতরূপী মেঘের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যাই। মেঘ অনেকটা 'কাব্যের উপেক্ষিত'। লেখক গভীর সহানুভূতির সহিত মেঘের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া এই অপূর্ব দূতটির সুখ-দুঃখ-বেদনা নিপুণ লেখনীর সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এমনভাবে করিয়াছেন যাহাতে মেঘই কাব্যের প্রধান পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে কালিদাসের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"It is hardly true to say that he personifies rivers and mountains and trees; to him they have a conscious individuality as truly and as certainly as animals or men or gods……It is delightful to imagine a meeting between Kalidasa and Darwin. They would have understood each other perfectly; for in each the same kind of imagination worked with the same wealth of observed fact." সত্যই, কামার্ত যক্ষের ন্যায় কালিদাসও ছিলেন যথার্থই চেতনাচেতন বিষয়ে 'প্রকৃতিকৃপণ'। লেখক মহাকবির সেই অভিনব কবিদৃষ্টি অনুসরণ করিয়াই 'মেঘদূত'-বর্ণিত প্রকৃতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া এক বিচিত্র আলেখ্যপরম্পরা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'মেঘদূতে' যাহা ছিল অব্যক্ত, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কম কৃতিত্ব নহে। লেখকের রচনা সরস, ভাষা কাব্যধর্মী, গম্ভীর সংস্কৃত শব্দের সহিত তিনি প্রচলিত ভাষার সমন্বয় সাধনে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। আর সর্বাপেক্ষা যাহা প্রীতিদায়ক, তিনি কালিদাস-

রসিক। সুশীলবাবু যে বাঙালী পাঠকগণকে মেঘদূতের আর একখানি পদ্যানুবাদ উপহার না দিয়া, তাহার মর্মব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার সুবিবেচনার পরিচায়ক। সুবিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব তাঁহার 'মেঘদূতে'র ইংরেজী পদ্যানুবাদের ভূমিকাস্বরূপ অনুবাদ সম্পর্কে সাধারণভাবে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আজও স্মরণীয়—

"It induces carelessness, encourages indolence, exercises no faculty but the memory, and employs that faculty with so little energy of application, that the impression received are faint and superficial, and fade and are effaced almost as soon as they are made."

আমরা সুশীল রায় মহাশয়কে মেঘদূতের আধুনিকতম ব্যাখ্যাতা রূপে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

দেশ ॥ ১৯৬০